BDeBooks.com

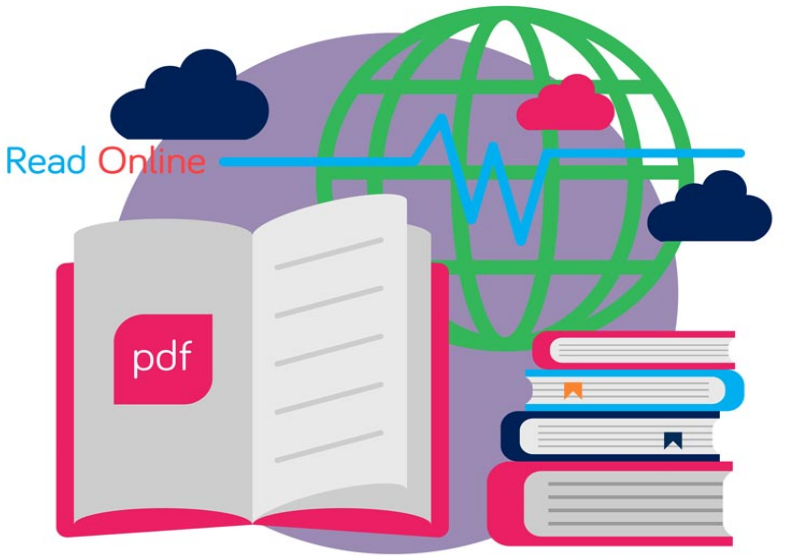

E-BOOK

www.BDeBooks.com
FB.com/BDeBooksCom
BDeBooks.Com@gmail.com

ঘুণপোকা

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

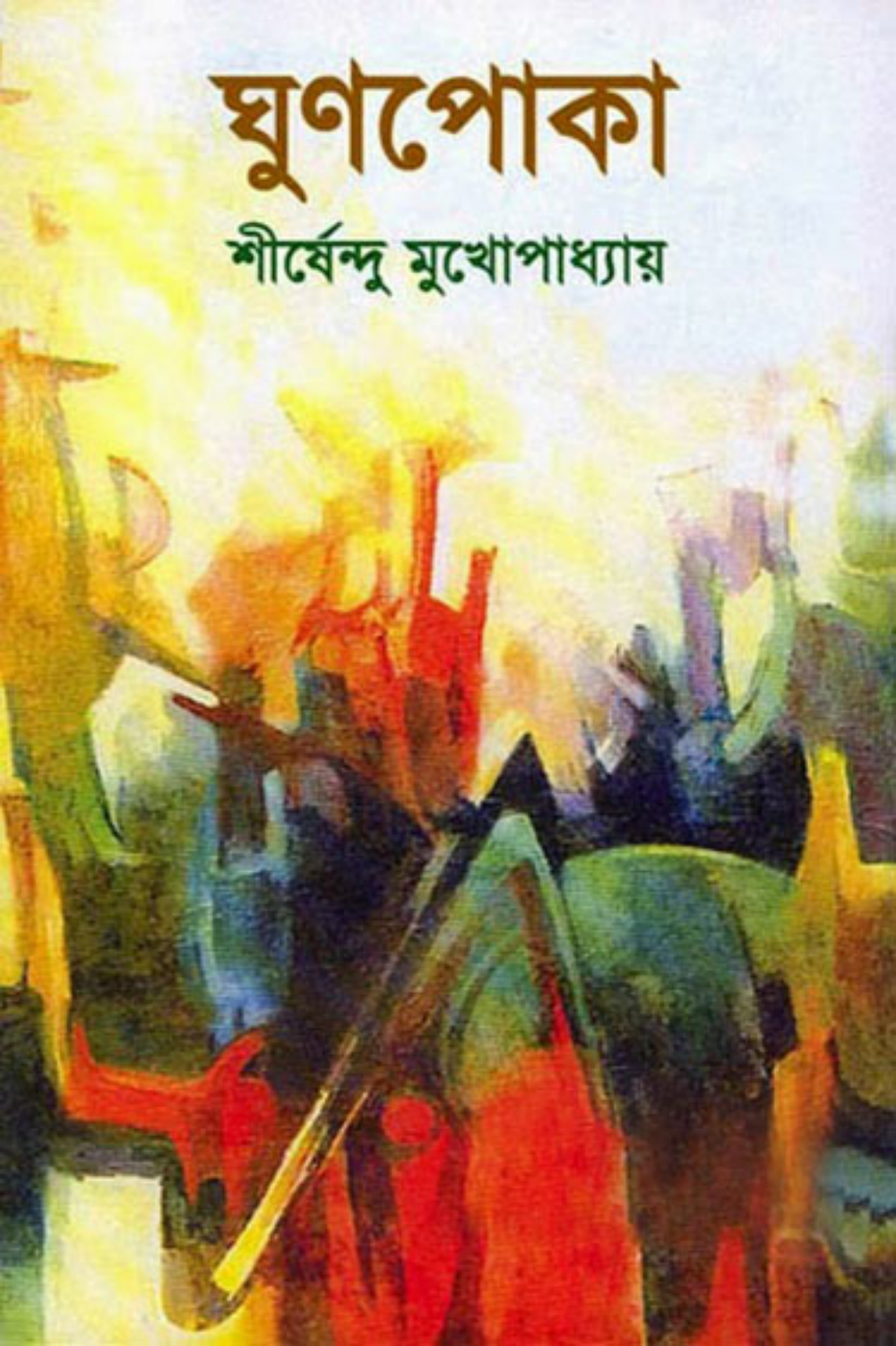

ঘুণপোকা

।।১।।

সেইন্ট্ অ্যাণ্ড মিলারের চাকরিটা জুন মাসে ছেড়ে দিল শ্যাম।

চাকরি ছাড়ার কারণটা তেমন গুরুতর কিছু ছিল না। তার ড্রইংয়ে একটা ভুল থাকায় উপরওয়ালা হরি মজুমদার জনান্তিকে বলেছিলেন-বাস্টার্ড। মজুমদার শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে গালাগাল দেয়। তা ছাড়া এতকাল শ্যাম হরি মজুমদারের অনেক হাব-ভাব, কথাবার্তা, নকল করে আসছিল। মাঝে মাঝে বেয়ারা এবং দু-একজন শিক্ষানবীশ ড্রাফটস্ম্যানকে সে মজুমদারের মার্কামারা গালাগালগুলো একই ভঙ্গীতে এবং সুরে উপহার দিয়েছে। এবং এমনকি তার এরকম বিশ্বাস এসে যাচ্ছিল যে, পুরনো এইসব গালাগালগুলো বহু ব্যবহারে শক্তিহীন হয়ে গেছে, এগুলোর আর তেমন জোর বা তেজ নেই। আরো কিছু নতুন রকমের গালাগাল আবিষ্কৃত না হলে আর চলছে না।

তবু মজুমদারের কথাটা কানে এলে দু' একদিন একটু ভাবল শ্যাম। মাঝে মাঝে অন্যমনস্কভাবে 'টাই'য়ের 'নট' নিয়ে নাড়াচাড়া করল, বাথরুমে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের মুখের দিকে অর্থহীনভাবে চেয়ে রইল, আড্ডা না মেরে ঘরে শুয়ে রইল সন্ধেবেলায়। মন-খারাপ তবু ছাড়ল না তাকে। সে নিজেকে বোঝাল যে গালাগালটা আসলে কিছুই না। মজুমদার শব্দের অর্থ ভেবে গাল দেয় না, সে শুধু ঐ সব শব্দ উচ্চারণ করে রাগ প্রকাশ করে মাত্র। শ্যাম নিজেও তো কতবার কতজনকে ওরকম গাল দিয়েছে; যা নিজেই সে লোককে দিয়েছে তা ফিরে পেতে আপত্তি হবে কেন? আর, এ চাকরি কিছু দিনের মধ্যেই সোনার ডিম পাড়বে। ইতিমধ্যেই সে বাজার ঘুরে ফ্রিজিডেয়ার রেডিওগ্রাম এবং পুরোনো ছোট্ট মোটরগাড়ির দাম জানবার চেষ্টা করেছে, বড়লোকদের নিরিবিলি পাড়ার দুই বা তিন ঘরের ছিমছাম একটা ফ্ল্যাটের সন্ধানেও ছিল সে। তবু বড় অসহায় বোধ করল শ্যাম। চাকরি ছাড়ার কথা সে ভাবতেও পারে না, কারণ এতদিনে এ চাকরি তাকে উচ্চাশাসম্পন্ন করে তুলেছে।

তবু আস্তে আস্তে শ্যামের ক্লান্তি বেড়ে চলল। শিস্ দিয়ে রাস্তায় হাঁটা রবিবারে শ্যাম্পু, ছুটির দুপুরে ঘুম-এ সবের ভেতর আর তেমন আনন্দ নেই। মাঝে মাঝে যে সব বড় রেস্তোরা বা বার-এ সে সময় কাটাতো সে সব জায়গায় যেতেও তার অনিচ্ছা দেখা দিল। অবসর সময়ে ভয়ঙ্কর অবসাদ আর মাথাধরা নিয়ে সে ঘরেই শুয়ে থাকতে লাগল। রাতেও ভাল ঘুম হয় না। দুদিন সে মাঝরাতে উঠে স্নান করল, তারপর সিগারেটের পর সিগারেট জ্বেলে সারাটা শেষরাতে ঘরময় পায়চারি করে বেড়াল। সে খুব ভাবপ্রবণ ছিল না কোনোদিন, গভীর চিন্তাও তার অপছন্দ ছিল, হুল্লোড় ছাড়া বাঁচা যায় না এমন বিশ্বাসই সে এতকাল পুষে এসেছে। কিন্তু ক্রমে বুঝতে পারল একটি গালাগাল থেকে একটি ভূত বেরিয়ে এসে তার মাথাময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর-একটা বদ-অভ্যাস দাঁড়িয়ে গেল তার-কেবলই সে আয়নায় মুখ দেখে দাড়ি কামানোর ছোট্ট হাত-আয়নাটা সে প্রায় সারাক্ষণ কাছে রাখে। বার বার মুখ দেখে। একদিন সে সবিস্ময়ে আয়নায় লক্ষ্য করল যে, তার ঠোঁট নড়ছে। সে উৎকর্ণ হয়ে শুনল যে সে বে-খেয়ালে আপনমনে উচ্চারণ করে চলেছে, বাস্টার্ড! বাস্টার্ড! খুব ভয় পেয়ে গেল শ্যাম, পাগল হয়ে যাচ্ছি না তো!

অবশেষে জুন মাসের এক ভয়ঙ্কর গ্রীষ্মের মাঝরাতে উঠে টেবিলল্যাম্প জেলে সে তার ইস্তফাপত্রটি লিখে ফেলল। আর একটি চিঠি লিখল মাকে... আমার চাকরি গিয়াছে। আমার উপর আর খুব ভরসা করিও না। অন্ততঃ আরো দু'তিন মাস তোমাদের কষ্ট করিয়া চালাইতে হইবে....। ইত্যাদি। চিঠি লিখবার পর সেই রাতে তার গভীর ঘুম হল।

শৌখিন জিনিসপত্রের মধ্যে তার ঘরে ছিল ভাড়া-করা একটা ওয়ার্ডরোব, আর একটা বুক কেস। রূপশ্রী ফার্নিশার্স থেকে লোক এসে একদিন ঠেলা-গাড়িতে তুলে সেগুলো নিয়ে গেল। মেজের ওপর স্তূপাকৃতি বই, ওয়ার্ডরোব আর বুক-কেসের দুটো চৌকো দাগ তেকে চোখ তুলে ঘরটাকে বেশ বড় বলে মনে হল তার। অনেক সুস্থ বোধ করল সে ভারমুক্ত হিসেব করে দেখল ফার্ম থেকে সে প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের যে টাকা পাবে তাতে ঘরটা আরো কিছুদিন রাখ যাবে। দক্ষিণ-খোলা সুন্দর ঘরটি তার, সঙ্গে স্নান-ঘর।

সূতীর জামাকাপড় পরা অনেক দিন হয় ছেড়ে দিয়েছিল শ্যাম। তার বেশীর ভাগই টেরিলিন, ট্রপিক্যাল বা সিল্কের শার্ট-প্যান্ট। বিদেশী টাইও ছিল কয়েকটা। ট্রাঙ্ক আর সুটকেশ খুলে সেগুলোর দিকে কৌতুকের চোখে চেয়ে দেখল সে। এখন আর এসব পরার মানে হয় না। খুঁজোপেতে সে ট্রাঙ্কের তলা থেকে পুরোনো কয়েকটা সূতির শার্টপ্যান্ট বের করল। প্যান্টের ঘের আঠারো ইঞ্চি, শার্টের কলার অনাধুনিক। সেগুলো পরে নিজেকে বে-টপ মনে হচ্ছিল তার। হাসি চেপে সে সেই পোশাকে চাকরি খুঁজতে বেরোলো।

চাকরি হ্যাঁ, হতে পারে। তার মতো অভিজ্ঞ, অথচ তরুণ লোকের চাকরি আটকাবে না। তবে একটু দেরী হবে। আর হ্যাঁ, সে হরি মজুমদারের ফার্ম ছাড়ল কেন? কোনো গোলমাল হয়েছিল? কী ধরনের গোলমাল! অত বড় ইঞ্জিনিয়ার, শেল্-ডিজাইনে যার জুড়ি নেই! তাছাড়া দেশী ফার্ম দেশের অহংকার! অমন লোকটাকে ছাড়ল কেন সে?

ক্রমে শ্যাম বুঝল এইসব ফার্মগুলোতে নালী ঘায়ের মতো মজুমদারের খ্যাতি ছড়িয়ে গেছে। মাস তিনেক পর আবার সামান্য ক্লান্তি ও মাথাধরা পেয়ে বসল তাকে। একদিন ভিড়ের এক চৌরাস্তায় দাঁড়িয়ে সিগারেট খেতে খেতে বিকেলের মরা আলোর দিকে চেয়ে সে বিড় বিড় করে বলল, আমি শেষ হয়ে গেছি। পরমুহূর্তেই চমকে উঠে সে দ্রুত এলোপাথাড়ি হাঁটতে লাগল।

আর একদিন সে হাত-আয়নাটা মুখের সামনে ধরে জিরাফের মতো গলা বাড়িয়ে ডানহাতের চকচকে একটা সুন্দর ব্লেড কণ্ঠনালীর ওপর রাখল সামান্য একটু চাপ দিল। বড় আরাম! কিছুক্ষণ পর সরু রক্তের কয়েকটা রেখা তার গেঞ্জীর ওপর নেমে বুক ভাসিয়ে দিল। ব্লেডটা ছুঁড়ে ফেলে সে হেসে আপনমনে বলল, ধ্যুৎ বড্ড নাটুকে। তারপর তোয়ালে দিয়ে গলা মুছে ডেটল লাগাল। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখল, রাস্তায় জীবন্ত মানুষজন চলাফেরা করছে। ক্ষতের ওপর ভেজা তুলো চেপে সে চোখ বুজল। আঃ। বড় আরাম।

তার দুটি শৌখিনতা ছিল। টেলিফোন করা, আর সকালে রোজ দাড়ি কামানো। অফিসে তার টেবিলে যখন নিজস্ব টেলিফোন থাকত তখন সে একটু অবসর পেলেই প্রায় অকারণে একে ওকে তাকে ফোন করত। কতজনকে যে সে তার ফোনের নম্বর দিয়েছিল তার ইয়ত্তা নেই। টেলিফোনে লোকের গলা শুনতে আর টেলিফোনের জন্যই তৈরী করা কৃত্রিম গলায় কথা বলতে তার ভাল লাগত। চাকরি যাওয়ার ছ'মাসের মধ্যে সে টেলিফোন করল মাত্র দু'টি। প্রথমটা করল কলেজ স্ট্রীট ওয়াই এম সি এ থেকে তার অফিসে, প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকাটা কবে পাওয়া যাবে তা জানতে। দ্বিতীয়টা করল শিয়ালদার স্বয়ংক্রিয় বুথ থেকে ইতুকে, যার সঙ্গে তার প্রথম পরিচয় দক্ষিণ কলকাতার এক রেস্তোরায় এবং যাকে কয়েকবারই সে তার শোওয়ার ঘরে নিয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত তাদের মেলামেশাটা, যা ঠিক প্রেম নয়, তা বিয়েতে একটা রফায় পৌছুতে পারত। তাদের এরকম কথাবার্তা হল।

শ্যাম—ইতু! কেমন আছো।

ইতু–ভাল না। তোমার দেখা নেই দু'মাস।
–আমার খোঁজ করেছিলে ?
–হ্যাঁ, অফিসে প্রায় মাস দুই আগে টেলিফোন করেছিলুম।
–ওরা কী বলল?
–বলল তোমাকে ..... তোমাকে ছাড়িয়ে দিয়েছে।
শ্যাম একটু ভেবে বলল– কথাটা ঠিক নয়। আমিই ছেড়ে দিয়েছি।
–কেন?
–হি কলড্ মি নেমস্।
–হু?
–দি বস্, দি বাস্টার্ড।
ইতু একটু চুপ থেকে বলল–এতদিন কী করছিলে? চাকরির খোঁজ!
–হুঁ।
–কিছু পেলে? বেটার কিছু?
–নৃ নূন্ নাঃ।
–এখন কী করবে?
শ্যাম মৃদু হাসল–ভাবছি বিয়ে করলে কেমন হয়। ইট্স্ হাই টাইম।
–বেশ তো! কাকে?
–তুমি রাজী আছ?
–হুঁউ। এক্ষুনি। বলতে বলতে ইতুর গলায় খুব আবেগ এসে গেল, মহীয়সী মহিলার মতো শোনালো তার গলা–শ্যাম, আমিও ছোটোখাটো একটা চাকরি করি, তা ছাড়া আমার কিছু গয়না আছে। আমাদের দু'জনের..

শুনতে শুনতে শ্যাম খুব ধীরে ধীরে কান থেকে ফোনটা নামিয়ে আনল্ তারপর ঘুমন্ত বাচ্চাকে মা যেভাবে শোওয়ায় সেই রকম সন্তর্পনে ক্র্যাডেলে রেখে দিল ফোনটা।

আজকাল প্রায়ই শ্যামের মুখে দাড়ি বেড়ে যায়। সেই চাপা চিবুক, গভীর খাঁজওয়ালা সুন্দর থুঁতনি, ঝকঝকে মুখে সামান্য নিষ্ঠুরতা–যা তাকে আকর্ষণীয় করে তুলত তা মাত্র কয়েক দিনের নাকামানো দাড়ির তলায় চাপা পড়ে যায়। বড় নিরীহ ও অসহায় দেখায় তাকে। কার্যকারণ সূত্র জানে না শ্যাম, তবু তার মনে হয় দাড়ি কামানো না থাকলে চোখ দুটোকেও কেমন যেন একটু ঘোলাটে আর অনুজ্জ্বল দেখায়।

সময় কাটে না বলে শ্যাম মাঝে মাঝে বাসে উঠে টার্মিনাল থেকে টার্মিনাল পর্যন্ত ঘুরে আসে। সুন্দর সময় কেটে যায়। একদিন বালিগঞ্জ থেকে শ্যামবাজারের বাসে উঠেছিল শ্যাম। ভবানীপুরে বাস বিকল হল। বিরক্ত না হয়ে শ্যাম ধীরে সুস্থে নেমে পড়ল। ঘড়িতে সময় দেখল, আড়াইটে। সামনেই একটা ফাঁকা সিনেমা হল। ছবির নামটাও পড়ল না শ্যাম, বাইরের আঁকা ছবিগুলোর দিকে ফিরেও তাকাল না, টিকিট কেটে ঢুকে পড়ল। নিশ্চিত ফ্লপ, ছবি লোকে দেখছে না। আধো অন্ধকার হলের ভিতরে পা দিতেই একটি টর্চের আলো আর একটা ভূতুড়ে হাত এগিয়ে আসে। নিশ্চিন্ত মনে টিকিটটা লোকটার হাতে গুঁজে দেয় শ্যাম, তারপর তার পিছু পিছু চলতে থাকে। সিট দেখিয়ে লোকটা ফিরে যাচ্ছিল, শ্যাম ডাকল–মানুমামা না? টর্চ হাতে লোকটা চমকে ফিরে তাকাল-আরে! শ্যাম! এই সিনেমা হলেই যে মানুমামা কাজ করে তা শ্যাম বার বারই ভুলে যায়। মনে পড়ে বেশ কিছুদিন আগে বৃন্দা নামে একটি মেয়ের সঙ্গে এখানে ছবি দেখতে এসেছিল একদিন, মানুমামার কথা তার খেয়াল ছিল না। সেদিনও মানুমামা সিট দেখিয়ে দিয়েছিল। বুদ্ধিমান মানুমামা সেদিন তাকে চিনবার বা তার সঙ্গে কথা বলবার কোনো চেষ্টা করেনি। তবু সারাক্ষণ ভয়ে কাঁটা হয়ে ছিল শ্যাম। বিরক্ত হয়ে ভেবেছিল আর কোনোদিন এই হলে আসবে না। কিন্তু এখন এবার সে আধো অন্ধকারে টর্চ হাতে মানুমামার দিকে সহজ চোখে

তাকিয়ে হেসে বলল– কেমন আছো মামু" তারপর কী ভেবে হঠাৎ অনভ্যাসজনিত দ্বিধা ত্যাগ করে নীচু হয়ে মানুমামাকে প্রণাম করল। অন্ততঃ বিশজন লোক এই দৃশ্য দেখল। খুশী হয়ে মানুমামা বলল, তোকে চেনাই যায় না, রোগা হয়ে গেছিস গালে একগাল দাড়ি কি হয়েছে? অমায়িক একটু হাসল শ্যাম, তারপর অবলীলায় বলল, গারদ থেকে বেরোলুম। মানুমামা চমকে ওঠে, কি গারদ? শ্যাম আস্তে করে বলে– পাগলা। মানুমামা একটু ইতস্ততঃ করে–চাকরিটা? শ্যাম বলে গেছে। মানুমামা দরজার দিকে চেয়ে ব্যস্ত হয়ে বলল, তুই বোস। আমি পরে এসে কথা বলে যাবো। শ্যাম বসল এবং আপনমনে হাসল। মিথ্যেটুকুর জন্য সামান্য ঘেন্না হচ্ছিল তার, তবু কে জানে হয়তো মানুমামা খুশীই হল। আত্মীয়-স্বজনদের সে বরাবর এড়িয়ে চলে তারাও তাকে ঘাঁটায় না। তার কোনো অমঙ্গল ঘটলে এরা কেউ কেউ খুশী হতে পারে। ইন্টারভ্যালোর পর হল অন্ধকার হয়ে গেল সে একসময়ে চমকে উঠে টের পেল তার ডান হাতে কে যেন একটি ভর্তি ঠোঙা গুঁজে দিচ্ছে। চেয়ে দেখল মানুমামা, বাদাম-চানাচুরের ঠোঙাটা তার হাতে গুঁজে দিয়ে সিটের পাশেই প্যাসেজে উবু হয়ে বসে হাসছে। সে তাকাতেই বলল, বড় ছেলে বিশুটাকে একদিন তোর কাছে পাঠাব। ওর সঙ্গে আমাদের বাসায় চলে আসবি। আমাদের গাড়িয়ায় মস্ত বড় এক তান্ত্রিক আছেন, সব অসুখ সারিয়ে দেন, তোকে দেখিয়ে দেবো। শ্যাম মৃদু হেসে বলল, দেখা যাবে। মানুমামা ভূতের মতোই হলের অন্ধকারে নিঃশব্দে মিলিয়ে গেল। শ্যাম গালের দাড়িতে হাত বোলায়। তার জামাকাপড় নোংরা, চোখ ঘোলাটে। কে জানে হয়তো তার দুর্দশা দেখে মানুমামা খুশী হয়নি। কাজেই মানুমামার ভুলটা ভেঙে দেওয়া দরকার মনে করে সে হঠাৎ ঘাড় ফিরিয়ে অন্ধকারে আন্দাজে 'মামু–উ' বলে ডাক দিল। সঙ্গে সঙ্গে পিছন থেকে তার কাঁধের ওপর একখানা ভারীহাত এসে পড়ল-আস্তে , দাদা! সামান্য হাসির শব্দ। ক্ষীণ অস্পষ্ট একটা গলাও শোনা গেল–মামাকে পরে খুঁজবেন এখন ছবি দেখুন। শ্যাম আস্তে করে বলল, শালা! তারপর চুপ করে অর্থহীন চোখে ছবি দেখতে লাগল। ভেবে দেখল এখন মামুর ভুল ভাঙতে গেলে আরো গেলমাল হয়ে যাবে। আরো ভেবে দেখল যে, কয়েকদিনের মধ্যেই তার অনেক আত্মীয়-স্বজন জেনে যাবে যে সে পাগল হয়ে গেছে বা গিয়েছিল! অন্ধকারে আপনমনে নিঃশব্দে হাসল শ্যাম, তারপর সিটের পিছনে মাথা হেলিয়ে আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়ল।

চাকরি যাওয়ার পর থেকে যে পাইস হোটেলে দুবেলা খাচ্ছিল শ্যাম, সেখানে সুবোধ মিত্রের সঙ্গে আলাপ। একদিন রাতে মুখোমুখি খেতে বসে মিত্র বলল–কী মশাই, সংসার-টংসার ছাড়ার মতলব আছে নাকি? দাড়িফাড়ি না কামালে যে বড় উদাসীন দেখায় আপনাকে!

শ্যাম মৃদু হাসে, সংসার কোথায় যে ছাড়াবো?

মিত্র বলে –কেন, আপনার তো মা বাবা আছেন! তাঁদের জন্য এবার একটি ডবকা দেখে দাসী এনে ফেলুন।

–সে তো আপনিও আনাতে পারতেন।

মিত্রকে হঠাৎ খুব গম্ভীর দেখালো। একটু চুপ করে থেকে শ্বাস ছেড়ে বলল– আমার জীবনে একটা ট্রাজেডী আছে মশাই। বলে আবার খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে মিত্র মৃদু হেসে গলা নামিয়ে বলল–আমার মশাই, একটা লাভ অ্যাফেয়ার ছিল। সে মেয়েটা তার বিয়ের পর অনেক কেঁদেকেটে আমাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিল যেন বিয়ে না করি। তখন সেন্টিমিন্টের বয়স, তাই প্রতিজ্ঞা করেছিলুম। কিন্তু এখন..... মিত্র শ্বাস ছেড়ে বলল– এখন ভাবি কী সব-বোকামি! এ সব প্রতিজ্ঞার কোনো দাম নেই, কী বলেন?

শ্যাম মোলায়েম গলায় বলে –দূর দূর.....

মিত্র নিশ্চিন্ত গলায় বলে–কি জানি মশাই, এখনো কেমন যেন খচ খচ করে মনের মধ্যে–

শ্যাম বিস্মিত গলায় বলে–শব্দ হয়?

–অ্যাঁ? অন্যমনস্ক মিত্র কথাটা খেয়াল করল না।

শ্যাম মাথা নেড়ে বলল–কিছু না।

হঠাৎ আগ্রহে ঝুঁকে পড়ে মিত্র বলল–আমার বয়স তেত্রিশ। আমরা মশাই ময়মনসিংহের মিত্র। ঝাড়া হাত পা একটি বোন ছিল, কাঁচড়াপাড়ায় বিয়ে দিয়েছি ছোটভাই সাহারাণপুরে ফিটার ভাল ফুটবল খেলতো। ছিলুম মা আর আমি তা মা মারা গেলে একটি চাকর রেখে চালাচ্ছিলুম সে চুরি করতে শুরু করায় তাকে ছাড়িয়ে দিয়ে এই হোটেলে জুটেছি, কিন্তু এখন মশাই পেটে সইছে না। তা ছাড়া মা মরে গিয়ে বাসাটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগে.. বলে একটু দুঃখের হাসি হাসল মিত্র– আমার মশাই দাবী-দাওয়া নেই। একটু দেখবেন তো

এত কথা শুনছিল না শ্যাম। মিত্রের বয়সের কথায় তার মন আটকে ছিল। মিত্রের বয়স তেত্রিশ। তার সন্দেহ হল যে, বিয়ের লোভে মিত্র অন্ততঃ সাত আট বছর বয়স কমিয়ে বলছে।

মিত্রের এঁটো ডান হাত শুকিয়ে কড়কড়ে হয়ে এসেছিল। সেদিকে তাকিয়ে হঠাৎ ঘেন্নায় লাফিয়ে উঠল শ্যাম, বলল–দেখব। তারপর আচাঁতে গিয়ে বেসিনের ওপর আয়নায় নিজের মুখখানা এক পলকে দেখে নিল সে। তেলতেল করছে তার মুখ, অযত্নে বেড়ে ওঠা দাড়ি, অনেকদিন তেল বা শ্যাম্পু না দেওয়া রুক্ষ চুলে তাকে পাগলাটে দেখায়। হাত-আয়নায় রোজ সে মুখ দেখে, কিন্তু এই বড় আয়নায় তাকে অন্যরকম দেখায়। তার মনে হয়, দু'চোখে এক ধরনের পরিবর্তন এসে যাচ্ছে।

আঁচিয়ে এসে মৌরি মুখে দিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল। ডিসেম্বরের শীতরাত্রির ফুটপাথে সে কয়েকটা ঘুমন্ত ঘেয়ো কুকুরকে ডিঙিয়ে গেল, পেরিয়ে গেল গাড়িবারান্দার তলায় শুয়ে থাকা জড়োসড়ো কয়েকটি ভিখিরিকে, যেতে যেতে বাড়ির দেয়ালগুলোতে হাত রেখে শিস দিল সে। সামনেই একটা পার্ক–শীত আর ঘণ কুয়াশায় জমে আছে। রেলিঙ টপকে সে ভিতরে ঢুকল। বেঞ্চিগুলি ফাঁকা পড়ে আছে। শ্যাম বসে সিগারেট ধরায়। পায়ের স্যান্ডেল ঘাসের শিশিরে ভিজে গেছে। পা বেয়ে শিরশির করে উঠে আসছে শীত, কুয়াশায় দমচাপা ভাব কাঠ কিংবা কয়লার ধোঁয়ার গন্ধ। শ্যাম নিশ্চিন্ত মনে বসে থাকে, ঘড়ির দিকে তাকায় না, তার মন গুনগুন করে ওঠে–উদাসীন, বড় উদাসীন দেখায় তোমাকে শ্যাম!

আকাশে তারা না, মেঘ না, কিছুই দেখা যায় না। শধু ধোঁয়ার মতো কুয়াশা তাকে ঘিরে ধরে। বহুদূর দিয়ে মন্থর বিষণ্ন ট্রাম চলে যাওয়ার শব্দ হয়, টুপ-টাপ করে অন্ধকারে কোথাও গাছের পাতা কি শিশির ঝড়ে পড়ে। দূরে কোনো ল্যাম্পপোস্টের ক্ষীণ আভা লেগে কুয়াশা সামান্য হলদে হয়ে আছে, এত ক্ষীণ সেই আলো যে, তাতে শ্যামের ছায়াও পড়ে না। শ্যামের মনে হয়, জীবনে সবচেয়ে সুসময় এইটাই যা সে পেরিয়ে যাচ্ছে। ভেবে দেখলে এখন তার মন উচ্চাশার হাত থেকে মুক্ত। তার চাকরি যাওয়ার পর ছ' মাস কেটে গেছে। হাতের জমানো টাকা ফুরিয়ে আসছে ক্রমে। তবু তার কোনো উদ্বেগ নেই। কোনো দুশ্চিন্তাই সে বোধ করছে না। তার পরনে ধুতি শার্ট আর কবেকার পুরোনো একটি এণ্ডির চাদর। ছ'মাস আগে এ পোশাকে বেরোনোর কথা তার কল্পনায়ও আসত না। দুপুরে তার অফিসে ছিল বাঁধা লাঞ্চ রাত্রে খাওয়ার স্থিরতা ছিল না– তা কোম্পানীর মক্কেলদেরই কেউ না কেউ তাকে বড় হোটেলগুলিতে নিয়ে যেতো। না, সে সৎ ছিল না, এখনো সততার প্রতি কোনো মোহ নেই। ইচ্ছে করলে এবং প্রয়োজন হলে এখনো সে যে কোনো কাজ করতে পারে যে কোনো পাপও। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এখন আর তার ইচ্ছাগুলির কোনোজোর নেই, না আছে কোনো স্পষ্ট প্রয়োজনবোধ। কি করে, কখন কবে তার উচ্চাশাগুলি নষ্ট হয়ে গেছে, কি ভাবেই বা কেটে গেছে উদ্বেগ তা সে টেরও পায়নি। নিজেকে বড় উদাসীন মনে হয় তার। হঠাৎ সুবোধ মিত্রের কথা মনে পড়লে সে 'আঃ' শব্দ করে অন্ধকারেই আপনমনে হেসে উঠল। চল্লিশে এসে মিত্র কাঙালের মতো বিয়ের কথা পাড়ছে এলোপাথাড়ি পাইস হোটেলে মুখোমুখি খেতে বসে। ইচ্ছে করে মিত্রের কাছে গিয়ে সে তার প্রেমের কাহিনীগুলি শুনিয়ে আসে। হ্যাঁ মশাই, সে সব মেয়ের কথা আপনি ভাবতেও পারবেন না। বৃন্দাকে প্রথম দেখি পার্ক স্ট্রীটের এক রেস্তরায় সঙ্গে ভালমানুষ গোছের একটি প্রেমিক ছেলে। দু'বার ঠিক দু'বার সে তাকিয়েছিল আমার দিকে–ঈশ্বরকে ধন্যবাদ–যেদিক থেকে আমার মুখশ্রী সবচেয়ে ভাল দেখায়,

সেই দিকটাই ফেরানো ছিল তার দিকে; হ্যাঁ মশাই, বাঁ দিক থেকেই আমাকে সবচেয়ে সুন্দর দেখায়। আমি তারপর সোজা উঠে গেলুম তাদের টেবিলের কাছে বৃন্দার দিকে চোখ রেখে আমি ছেলেটার দিকে হাত বাড়ালুম–দেশলাইটা। বিরক্তির সঙ্গেই বোধ হয় ছেলেটি দেশলাই এগিয়ে দিলে। অপ্রয়োজনে সিগারেট ধরাতে ধরাতে আমি বৃন্দার দিকে চেয়ে একটু হেসেছিলুম। সেই হাসি আমি শিখেছিলুম কলকাতার সবচেয়ে সেরা বদমাশদের কাছ থেকে। অনেক বার ও রেস্তোরাঁ ঘুরে তা আমাকে শিখতে হয়েছিল। তার পরদিন বৃন্দা সেই রেস্তোরাঁয় এসেছিল একা। কি করে সে তার প্রেমিক সঙ্গীটিকে কাটিয়ে এসেছিল তা আমিও জানি না। হ্যাঁ মশাই, তারপর বৃন্দাকে অনেক দূর নিয়ে যেতে পেরেছিলুম। কিংবা মাধবীর কথা ধরা যাক–যাকে আমি প্রথম দেখি এক ফিল্ম ক্লাবের শোতে। যার নীল রঙের প্লিমাউথ গাড়িটাকে আমার ভাড়াটে ট্যাক্সি বাঘের মতো তাড়া করেছিল। তারপর মাধীবকেও একদিন –হ্যাঁ মশাই, তারপর মাধবীও একদিন বলেছিল-দিন দিন তুমি কী হয়ে যাচ্ছো শ্যাম, তুমি ইতরের মতো তাকাতে শিখেছো–বলতে বলতে সে তার নরম মেরুদন্ড পিছনে হেলিয়ে ভেঙে দিয়েছিল সবুজ ডিভানে। তবু বলি, আমার মন ছিল হাঁসের শরীর। আমার শরীরের ভিতরে ছিল বিশুদ্ধ বাতাস, আর উজ্জ্বল রক্ত। কোনোদিন কখনো কোনো মেয়ের জন্য আমি হাঁটু ভেঙে প্রার্থনায় বসিনি। বলিনি–দয়া করে আমাকে ভালোবাসো। কেননা তার দরকার ছিল না। শুধু ঐ মেয়েটি, ঐ আটপৌরে ইতু কোনোদিনই বিয়ে করার কথা ভুলতে পারল না। যেমন পারেননি আপনি। কেমন সেই মেয়ে যার প্রেমে আপনি চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত টিকে গেলেন। প্রেমের নামে আমি মশাই শিস দিই, আমার চোখ ইতর হয়ে যায়, আমার ঠোঁটে ফুটে ওঠে সেই হাসি। আমি প্রেম ঐরকম বুঝি মশাই। আমার কেবল ভয় ঐ আটপৌরে মেয়েদের চারদিন কথা বলার পর যারা পাঁচদিনের দিন মিনমিন করে বলে–বাবা বলছিল, ছেলেটাকে একবার নিয়ে আসিস তো খুকী, দেখব। হ্যাঁগো মিত্তিরমশাই, আপনার জুলিয়েটটি কেমন ছিল? ঐ রকম আটপৌরে তো, শেষ পর্যন্ত দেখুন এত বয়সেও আপনাকে হাফ-সন্ন্যাসী! করে রেখে গেছে! বিয়ে করবেন? তা আপনার কপালে ঐ রকম আটপৌরেই জোটার সম্ভাবনা যে আর–একজন সন্ন্যাস বানিয়ে আপনার ঘর করতে আসবে নিশ্চিন্ত মুখে। তার সেই প্রেমিকের স্মৃতি তার চন্দনের হাতবাক্স, বা গোপন চিঠির মতো মাঝে মাঝে পানের বাটার সামনে বসে বা ছেলে মানুষ করতে করতে মনে মনে নেড়েচেড়ে দেখবে। ঈশ্বর! আমার ভাগ্য ভাল যে, আমার শরীরের ভিতরে এখনো রয়েছে বিশুদ্ধ বাতাস আর উজ্জ্বল রক্ত। কখনো কোনো মেয়ের জন্য আমি হাঁটু গেড়ে বসিনি প্রার্থনায়। আমার মন মশাই হাঁসের শরীর। হ্যাঁ, চম ৎকারভাবেই আমি এতকাল মেয়েদের ব্যবহার করে এসেছি। আঁচলের গেরোয় বাঁধা পড়িনি। আমি নিষ্কলঙ্ক ও বিশুদ্ধ। আজ আমার দূরবস্থা দেখে ভাববেন না। সেই তরমুজ বিক্রেতার কথা ভেবে দেখুন যে বলেছিল– আমরা কি ভগবানের হাত থেকে কেবল ভালটাই গ্রহণ করব, মন্দটা নয়? তা আমার অবস্থা এমন কি খারাপও নয়। চাকরি নেই, কিন্তু যে কোন সময়ে চাকরি হয়ে যেতে পারে। দরকার একটু ঘোরাঘুরির উৎসাহ। দাড়িটা যদি কামাই, ছ'মাস আগেকার প্যান্ট শার্ট টাই যদি গায়ে দিই, আর চোখের সেই অভ্যস্ত চাউনি আর হাসিটা যদি দু-একদিন অভ্যেস করে নিই, তবে অল্পদিনেই আবার আমার চারদিকে চাঁদের জেল্লা লেগে যাবে। হায়, শুধু কেবল কেন যেন উৎসাহ পাই না আর! আঃ আমার হাই উঠছে।

বাস্তবিক শ্যামের হাই উঠছিল। কুয়াশা আরো একটু ঘন হয়েছে। তার শীত করতে থাকে। দূরে কোথাও ফুটপাথে পাহারাওয়ালার লাঠি ঠোকার আওয়াজ হচ্ছে। ঘড়ি এই আলো-আঁধারিতে দেখা যায় না, সে সময় আন্দাজ করার চেষ্টা করল। বুঝতে পারল না। কুকুর কাঁদছে, শোনা যাচ্ছে ক্ষীণ কণ্ঠের একটু গান। শ্যাম উঠে পড়ল।

সেই রাত্রে শ্যাম ছোট হাত-আয়নায় তার মুখখানা পবিত্র গ্রন্থের মতো পাঠ করল রাত জেগে জেগে। উদাসীন! বড় কি উদাসীন দেখায় আমাকে! ভাবতে ভাবতে শ্যাম হেসে উঠল। গড়িয়ে পড়ল বিছানায়। তারপর অতর্কিতে ঘুমিয়ে পড়ল আলো না নিভিয়ে।

শীত এসে গেছে। কলকাতার স্বল্প স্থায়ী শীত। বাতাসে শৌখীন ঠাণ্ডা ভাব। রোজ সকালে অল্প কুয়াশা হয়,রোদের রঙ থাকে লাল। আগে যখন সাড়ে আটটায় অফিসে যাওয়ার জন্য বেরিয়ে পড়তে হত, সেই তখনকার পুরোনো অভ্যাসমতোই সকালে ঘুম ভেঙে যায় শ্যামের। ভোরের জানালার দিকে সে এক পলক চেয়ে দেখে, তারপর আবার চোখ বুজে বালিশ আঁকড়ে ধরে চোখের ওপর লেপ টেনে আলো ঢেকে দেয়। শরীরের ভিতরে জ্বরভাব, শীত আর সামান্য মাথাধরা নিয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ে। শরীর তাজা রাখার জন্য সে আগে ভোরে উঠে সামান্য ফ্রি-হ্যাণ্ড ব্যায়াম করত, কয়েকটা বেন্ডিং আর তিন চারটে আসন। সে কথা ভাবতেই এখন ক্লান্তিতে হাই ওঠে তার। চোখ বুজে সে পুরোনো শ্যামকে দেখতে পায়। দেখে, সে মেঝেতে ব্যাঙের মতো হাত-পা ছড়িয়ে ডন মারছে, কখনো নীচু হয়ে পায়ের বুড়ো আঙুল ছোঁয়ার চেষ্টা করছে, কখনো বা বাতাসে ঘুষি ছুঁড়েতে ছুঁড়তে অদৃশ্য প্রতিপক্ষকে তাড়া করে ফিরছে ঘরময়। সেই ঘুষিতে একবার রূপশ্রী ফার্নিশার্সের ওয়ার্ডরোবটার একটা পাল্লা চোট খেয়েছিল আর দেয়ালের দুর্বল একটা জায়গায় চুনাবালি খসে পড়েছিল বলে বড় খুশী হয়ে ছিল শ্যাম। পুরোনো সে শ্যামের শরীর নিয়ে এই সব অর্থহীন নাড়াচাড়া মনে করে সে হাসে, তারপর দেয়ালের দিকে পাশ ফিরে শোয়। শরীরের ওপর বড় মায়া ছিল শ্যামের সবসময়ে নিজেকে সে চোখে চোখে রাখত। সে খুব সতর্কভাবে রাস্তা পার হত, সুন্দর ভঙ্গীতে সিঁড়ি বেয়ে উঠত কিংবা নামত, সুন্দর ভঙ্গীতে টেলিফোন তুলে নিত কানে–সবকিছুতেই তখন বড় মনোযোগ ছিল তার। যেন কখনো কোনো সময়েই তাকে কুৎসিত না দেখায়।

লেপের ভিতরে একটা খোঁদল তৈরি করে শুয়ে থাকে শ্যাম। আস্তে আস্তে বেলা গাড়িয়ে যায়। খোঁদলের ভিতর তার নিঃশ্বাস আর গায়ের তাপ জমে ওঠে। মুখের ঢাকা সরালে চোখে আলো এসে ঘরময় পারচারি করে। মাঝে মাঝে এক কাপ চা খেতে ইচ্ছে করে। ঘরেই রয়েছে তার চায়ের সরঞ্জাম–কেরোসিন স্টোভ, কেটলী চা, চিনি, দুধের কৌটো। চাকরির সময়ে সে সকালের সামান্য অবসরেই চা তৈরী করত, ডিম সিদ্ধ করে খেয়ে নিত। এখন আর তার অত সময় নেই। গত কয়েক মাসে কৌটোর চায়ে ছাতা ধরেছে বোধ হয়, হয়তো পচে গেছে টিনের দুধ– সে খুলে দেখেনি। এখন ইংরিজি খবরের কাগজখানা মেঝের পায়ের নীচে লুটোপুটি খায়, আগে সেখানার কদর ছিল–সকালে আগাপাশতলা চোখ বুলোতো, রাত্রে ফিরে কখনো কখনো ভাল করে খুঁটিয়ে পড়ত।

বেলা আর একটু বাড়লে সে হোটেলের দিকে বেরিয়ে পড়ে। তারপর সোজা চলে যায় দুপুরের ফাঁকা কোনো বাস বা ট্রাম টার্মিনাল বা স্টপে। চেনাশোনা লোকের সঙ্গে বড় একটা দেখা হয় না। হলেও শ্যাম এড়িয়ে যেতে পারে। তার গালে দাড়ি, চুল বড় বড় এবং ভাগ্যক্রমে সে অনেকটা রোগা আর কালো হয়ে গেছে, হাঁটাচলার ভঙ্গীও পাল্টে ফেলেছে অনেকটা, তা ছাড়া সে ভেবেচিন্তে একটা রোদ-চশমা কিনে নিয়েছে। সব মিলিয়ে খুবই সহজ ও স্বাভাবিক তার ছদ্মবেশ। এই আড়াল থেকে সে মাঝে মাঝে দু'-একজন চেনা মানুষকে অসতর্ক অবস্থায় দেখে নেয়। একদিন মাধুকে দেখল শ্যাম। দিব্যি মোটাসোটা হয়েছে মাধু চর্বিতে থলথল করছে শরীর এই শীতেও ঘামছে। ঘামে আর চর্বিতে নাকের ভারী চশমাটা পিছলে নেমে এসেছে অনেকটা। পায়ের একটা স্যান্ডেলের স্ট্র্যাপ ছিঁড়ে গেছে, সেই ছেঁড়া চটি হাতে নিয়ে খুবই বিপন্ন আর চিন্তিত মুখে ট্রামের সীটে বসে আছে মাধু। আরো লক্ষ্য করল শ্যাম –মাধুর গায়ে নতুন মটকার পাঞ্জাবি ধোয়া ধুতি পরনে, কাঁধে শাল,আর শালের নীচে শান্তি নিকেতনী ঝোলা ব্যাগ। বছরখানেক আগে যখন দেখা হত, তখন বাইরে মফঃস্বলের কোথাও মাস্টারী করত মাধু তখন ওর মায়ের ক্যান্সার, প্রায়ই কলকাতায় ছোটাছুটি করতে হত। শ্যামকে কতবার বলেছে মাধু-মামাকে কলকাতায় একটা চাকরি জুটিয়ে দে শ্যাম, মফঃস্বলে লাইফ নেই। তা ছাড়া অমার মায়ের ক্যান্সার বিশুদ্ধ আর উদভ্রান্ত দেখতো মাধুকে, এড়িয়ে যেতো শ্যাম। ভিড়ের ভিতরে বড় ধরে দাঁড়িয়ে থাকলেও ট্রামে মাধুকে শ্যামের সঙ্গে বন্ধুর মতো মিশতে পারত না চাকরবাকরের মতো ব্যবহার

করত। মৃদু হেসে তাই মাধুকে এড়িয়ে যেতো শ্যাম। ভীড়ের ভিতরে রড ধরে দাঁড়িয়ে বিকেলের ট্রামে মাধুকে ভাল করে লক্ষ্য করছিল শ্যাম। মাধুকে বেশ তৃপ্ত দেখাচ্ছিল–শুধু স্ট্র্যাম-ছেঁড়া চটিটার জন্যেই যা একটু চিন্তিত বোধ হয়। ধার দিয়ে শ্যামের মনে থাকে না, ধার নিয়েও নয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, আজ তার হঠাৎ মনে পড়ে গেল মাধুর কাছে তার পঁচিশটা -টাকা পাওনা আছে। মনে হচ্ছে, মাধুর অবস্থা এখন ভালই। মাধুর কাছে টাকাটা চেয়ে বসলে কেমন হয়? ভাবতেই হাসিতে তার গা শিরশির করে উঠল। একট্রাম ভিড়ের মধ্যে বেশ গলা ছেড়েই টাকাটার কথা বলা যাবে। ভেবে ভিড়ের মধ্যে ঠেলেঠুলে সামান্য এগিয়ে গিয়েছিল শ্যাম হঠাৎ মাঝপথে থেমে সে নিশ্বাসের সঙ্গে গালাগাল দিল–শালা হারামী বিট্রেয়ার। কেননা মাধুর পাশে জানালার ধার ঘেঁষে বসে আছে সুন্দর কটকী ছাপের শাড়ি পরা অল্পবয়সী একটি বউ–মাধুর বউ সন্দেহ নেই। ভিড়ে এতক্ষণ বৌটি আড়াল ছিল। জানালার কাঠে কনুইয়ের ভর হাতের চেটোয় রেখেছে মুখ, সে মুখ জানালার দিকে ফেরানো। শ্যাম গলা বাড়িয়ে দেখছিল । খেয়াল ছিল না, তার খোঁচা দাড়ির ঘষা লাগল মোটা মত একটা লোকের ঘাড়ে। লোকটা মুখ ফিরিয়ে নীরবে চোখ দিয়ে একটা ধমক দিলে শ্যাম সামান্য পিছিয়ে আসে। বস্তুতঃ মাধুর মা যে আর বেঁচে নেই, তা মাধুর তপ্ত মুখচোখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল। আর ঐ বউটা বোধ হয় মাধুর মায়ের শেষ ইচ্ছে। ছেলের বউ না দেখে মরবেন না এরকম একটা বায়না ধরছিলেন বলেই বোধ হয় মাধু তাড়াহুড়ো করে বিয়েটা করে ফেলেছে। নইলে ওর যা রোজগার তাতে বিয়ে করার কথা নয়। অবশ্য মা মরে গিয়ে থাকলে এখন মাধুর খরচ কিছুটা বাঁচছে। কে জানে, হয়তো মা মরে যাবে হিসেব করেই সামান্য ঝুঁকি নিয়ে বিয়েটা করেছে ও। শ্যাম আবার মনে মনে বলল–শালা বিট্রেয়ার। অকারণেই মাধুর ওপর তার রাগ হচ্ছিল। ঠাণ্ডা মাথায় সে ভেবে দেখল এখন মাধুকে দু'ভাবে বিপদে ফেলা যায়। সোজা ওর কাছে গিয়ে বলা যায়–আরে মাধু!

ভীষণ চমকে উঠে তাকে দেখে অস্বস্তির হাসি হাসবে মাধু–ম্যাম! ইস্, তোকে চেনাই যায় না! তারপর......?

–তুই একটু মুটিয়েছিস। বলেই হেসে চোখের ইঙ্গিত করবে শ্যাম, বউটিকে দেখিয়ে ভ্রূ নাচাবে– কে?

–এ হেঃ, তোকে খবর দিইনি বুঝি! এ হচ্ছে মাধুরী, আমার বউ। তারপর প্রায় জলে পড়ে গিয়ে বউয়ের দিকে মুখ নামিয়ে বলবে মাধুরী–, এই শ্যাম, আমার বন্ধু। এর কথা–তারপর শ্যামের দিকে ফিরে বলবে, তোর অফিসে কিন্তু খবর দিতে গিয়েছিলাম। ওরা বলল তোর চাকরি গেছে।

ব্যস, ওটুকুতেই শ্যাম ওকে অপমান করার যথেষ্ট কারণ পেয়ে যাবে। সকলের সামনে ও তার চাকরি যাওয়ার কথা কেন বলল? তখন সে মৃদু হেসে বলবে–হ্যাঁ, গেছে। বড় কষ্টে আছি ভাই। তারপর গলা সামান্য খাটো করবে শ্যাম এমনভাবে, যেন বউটি এবং কাছাকাছি কয়েকজন শুনতে পায়–মাধু, তোর কাছে যে টাকাটা পাওনা আছে–

–মাধু, বিপন্ন মুখে–কোনটা বল তো!

–ঐ যে বে শালা, গত শীতে এক রাতে মাল খাবি বলে নিয়েছিলি! মনে নেই? বলতে বলতে শ্যাম লক্ষ্য করবে বউটি নড়ে উঠল একটু।

মাধু ভীষণ ভয় পেয়ে বলবে–আমি?

হ্যাঁ রে শালা, এক শনিবার, তুই রেসের মাঠে পঁয়ষট্টি টাকা হেরে গেলি! পবননন্দন আর টিটানির ওপর ডাবল ধরেছিলি–মনে নেই! তারপর বালাসিটোলা–

জীবনে মদ খেয়েছে মাধু–এমন মনে হয় না। তবু শ্যাম জানে এ সব কথা চাপা দেওয়ার জন্যেই কাষ্ঠহাসি হেসে মাধু বলবে–ওঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ, শ্যাম কী রোগা হয়ে গেছিস! একদিন আয় না, কলকাতাতেই বাসা করেছি এখন, এখানেই চাকরি।

সঙ্গে সঙ্গে শ্যাম বলবে–যাবো। ঠিকানাটা–?

বিমর্ষ মুখে মাধু ঠিকানা বলে যাবে, বলবে–টুইশ্যানির জ্বালায় ঘরে থাকা যায় না রে ছুটির দিনে আসিস ; আগে খবর দিবি, নইলে সিনেমা–টিনেমায় হয়তো গেলুম–

বস্তুতঃ ঠিকানা দিয়ে মাধু আর এক ধরনের বিপদে পড়বে। মৃদু বিষের মতো সেই বিপদ। কেননা মাধু দেখেছে কেমন কৃতিত্বের সঙ্গে অনায়াসে মেয়েদের ব্যবহার করে শ্যাম। তাছাড়া শ্যামের না আছে বাছবিচার, না আছে ধর্মবোধ। ঠিকানা দিয়ে তার সেই ভয় হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে বউটি ঠিকঠাক সতী হলেও কোনো লাভ নেই। বউকে বিশ্বাস করবে এমন মনের জোর মাধুর কোথায়?

এ সব কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ আপন মনে হেসে উঠল শ্যাম। কাছাকাছি লোকেরা তার দিকে চেয়ে দেখল। মাধু নেমে গেল কালীঘাটে, গোয়ালন্দের স্টীমারের মতো ভিড় ঠেলতে ঠেলতে এক হাতে সসঙ্কোচে ধরে থাকা ছেঁড়া চটি, পিছনে বউ। তার দিকে ফিরেও তাকাল না। বউটির ঘোমটার পাড় শ্যামের থুঁতনি ছুঁয়ে গেল। নেমে দাঁড়াতে একটু গলা বাড়িয়ে দেখল শ্যাম–বউটা মাধুর সমান লম্বা। স্টপ ছেড়ে যাচ্ছে ট্রাম, এ সময়ে শ্যামের মনে হল, একটা কিছু করলে হত। তার সামান্য আফসোস হচ্ছিল। তার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে সেই মোটা লোকটা। শ্যামের ইচ্ছে হচ্ছিল তার ঘাড়ে আর একবার দাড়ি ঘষে দেয়। তারপর এক সময়ে সে মনে মনে মাধুকে মুক্তি দিয়ে বলল–তুই আরো সুখী হয়ে যা মাধু, তুই আরো মোটা হয়ে যা। তোকে পঁচিশ টাকা ছেড়ে দিলুম। আশীর্বাদ করছি, তোকে যেন বেশী হাঁটতে না হয়, যেন কাছাকাছিই তুই একটা মুচি পেয়ে যাস। মনে মনে এই কথা বলে খুব তৃপ্তি পেল শ্যাম।

আর –একদিন হঠাৎ ডবলডেকারে কলেজ স্ট্রীট পেরিয়ে যেতে যেতে দোতলা থেকে শ্যাম একঝলক দেখতে পেল আরপুলি লেনের মুখে দেয়ালে ঠেস দিয়ে মিনু দাঁড়িয়ে আছে। গায়ে একটা শেয়াল রঙের পুলওয়াভার, পরনে কালো চাপা একটা প্যান্ট, পায়ে হকিবুট। বুকের ওপর আড়াআড়ি হাত, একটা হাঁটু ভাঁজ করা–পা পিছনের দেয়ালে তোলা, মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে মিনু। হঠাৎ দেখলে মনে হয় ঘুমিয়ে আছে। কিন্তু শ্যাম জানে মুহূর্তেই ঐ ভঙ্গী মিনু বদলে ফেলতে পারে, শরীরের ভাঁজ খুলে যখন সোজা হয়ে দাঁড়ায় তখন তার কালো লম্বা চেহারাটা ঝলকঝলক করে ওঠে। একঝলক মিনুকে ঐভাবে দেখে শ্যামের মন 'মিনু' বলে চেঁচিয়ে উঠেছিল। নামবার জন্যে সে তাড়াতাড়ি উঠতে যাচ্ছিল। তারপর দেখল বাসে বেজায় ভিড়, নামতে নামতে সে আরো দুটো স্টপ ছাড়িয়ে যাবে। তারপর পিছু হটে এসেও যে মিনুকে ঐখানে পাওয়া যাবেই তার কোনো স্থিরতা নেই। তা ছাড়া দেখা হলেও সবসময়ে লাভ হয় না। হাতে কাজ থাকলে তাকে চিনবেই না মিনু। অল্প একটু হেসে হয়তো বলবে, 'আরে শ্যাম! আজ তুই কেটে পড়, আমার কাজ আছে।' 'কি কাজ!' মাথায় সামান্য আঙুল চালিয়ে ঠাণ্ডাগলায় বলবে মিনু, 'ঝামেলা হবে এক্ষুণি। তুই কেটে পড়।' এ সব কথা যখন বলে মিনু তখন তার গলার স্বরে এক ধরনের চমক লক্ষ করছে শ্যাম। হঠাৎ মনে হয় মিনুর গলায় মাইক্রোফোন লাগানো আছে। স্বর খুব উঁচু নয়,তবু মনে হয় তা খুব গভীর কুয়োর ভিতর থেকে আসছে। ঐ স্বর শুনে যে-কোন লোকের বুকের ভিতর গুরগুর করে উঠতে পারে।

মিনুর সঙ্গে একবার দেখা বছর আট-দশ আগে। তখন শ্যাম ছোট্ট একটা কোম্পানীতে দুশো টাকার একটা সামান্য কাজ করে। এক তারিখে মাইনে পেয়ে সে ভিড়ের বাসের দরজায় ঝুলে ফিরছিল। কালীঘাটের স্টপে বাস থেমে ছাড়ার মুহূর্তে শ্যাম অস্পষ্টভাবে শুনতে পেল কেউ তার নাম ধরে ডাকছে। বাস ছেড়ে দিল। কিন্তু শ্যামা টের পেল ভিড়ের মধ্যে লোহার মতো শক্ত একখানা হাতের পাঞ্জা তার কনুইয়ের ওপর চেপে ধরেছে। পরমুহূর্তেই সেই হাতখানা তাকে বাসের হাতল থেকে ছিঁড়ে আনল। কার মাথায় শ্যামের দাঁত ঠুকে গেল, আর একখানা কনুই লাগল বুকে। দরজার লোকেরা চেঁচিয়ে উঠেছিল, বাসটা থামতে থামতেও থামল না। বাতাস আঁকড়ে ধরার চেষ্টায় শূন্যে হাত তুলে টাল খেয়ে ঘুরে ফুটপাথে আছড়ে পড়ে যাচ্ছিল শ্যাম। কিন্তু যে তাকে ধরেছিল সে তাকে পড়ে যেতে তাই দিল না। দাঁড় করিয়ে দিল। ব্যাথায় চোখে জল

এসে গিয়েছিল শ্যামের, মাথার ভিতরে ধোঁয়াটে ভাব। তাই সে কিছুক্ষণ বুঝতেই পারল না যে, কে তাকে টেনে নামিয়েছে। তারপর অবশেষে সে মিনুকে দেখতে পেল। শীতকালে মিনুর সেই মার্কমারা পোশাক–শেয়াল রঙের পুলওভার আর কালো চাপা প্যান্ট। মিনু হাসছে। দু'-একজন চলতি লোক দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, তাই মিনু তার হাত ধরে একটু দূরে নিয়ে গেল। মুখোমুখি দাঁড়ালে মিনু তার দীর্ঘ লোহার রডের মতো শক্ত ডান হাতখানা শ্যামের কাঁদে আলতোভাবে রেখে নিঃশব্দে হাসল, তোর লেগেছে শ্যাম? শ্যাম মৃদু হেসে মাথা নাড়ল–না। আবার নিঃশব্দে হেসে ডান হাতখানা খুব ধীরে ধীরে তার কাঁধ থেকে সরিয়ে নিয়ে প্যান্টের পকেটে রাখল। তারপর চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ। তার দাঁড়ানোর ভঙ্গী দেখে মনে হয় দু'পা মাটিতে পুঁতে দাঁড়িয়ে আছে, একটুও নড়ানো যাবে না। এমনিতে মিনুর চোখ সুন্দর–টানা, ভাসা ভাসা। চোখের পাতায় অর্ধেক ঢাকা আধ–ঘুমন্ত চোখে উদাসীন বিরাগ নিয়ে চারদিকে চেয়ে দেখে। কিন্তু যখন কখনো হঠাৎ ভ্রূ কুঁচকে গম্ভীর মিনু তাকায়, তখন এক পলকে ওর চেহারা পালটে যায় দয়াহীন, নিষ্ঠুর মিনুকে তখন আর চেনা যায় না। অল্প ভ্রূ কোঁচকানোর ভিতর দিয়ে মিনু প্রায় ম্যাজিক দেখাতে পারে। শ্যাম তখন ভাল ছেলে। তাই সামান্য অস্বস্তি নিয়ে মিনুর সেই শান্ত, আধখোলা, আধ–ঘুমন্ত চোখের দিকে চেয়ে রইল। সে স্পষ্টই বোঝাতে চেয়েছিল–আমি খুশী হইনি... তোকে দেখে খুশী হইনি মিনু।

অনেকক্ষণ চিন্তিতভাবে শ্যামের মুখের দিকে চেয়ে থেকে হঠাৎ মিনু বলল, আজ এক তারিখ, তোর কাছে আজ অনেক টাকা আছে না শ্যাম বুঝতে পারছিল ছেলেবেলার পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে একটু কথা বলার জন্যই যে মিনু তাকে বাস থেকে টেনে নামিয়েছে তা নয়। মিনুর সঙ্গে দেখা হলে শ্যাম যে খুশী হয় না তা বোধ হয় মিনু জানে। বস্তুতঃ তাদের আর বন্ধু বলা যায় না। শ্যাম তাই মিনুর মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু আন্দাজ করার চেষ্টা করছিল। অকারণেই একটা ভয় পেয়ে বসছিল তাকে। বিকেলের রাস্তায় অনেক লোক রয়েছে তাদের চারপাশে তবু শ্যামের নিজেকে বড় একলা মনে হচ্ছিল। মিনুকে কী ভীষণ চ্যাঙা আর কালো দেখাচ্ছে! শ্যাম মিনুর মুখের দিকে চোখ রেখে অল্প মাথা নেড়ে বলল, আজ মাইনে পেয়েছি।

মিনু দুই পকেটে হাত রেখে কাঁধ দুটো অল্প তুলে আবার নিঃশব্দে হাসল, জানতুম। তাই তোকে ও বাসটায় যেতে দিলুম না। বাসটা গরম ছিল। 'গরম' কথাটার অর্থ শ্যাম যে একেবারে বোঝে না তা নয়। তবু চুপ করে চেয়ে রইল। মিনু সস্নেহে হেসে বলল, ও বাসে যে ছোকরারা ছিল তারা আমার চেনা, ওদের হাত খুব পরিষ্কার, তুই টেরও পেতিস না। শুনে শ্যাম চকিতে তার পকেট দেখাবার জন্য হাত বাড়াতেই মিনু হাত তুলে হাসল–ভয় নেই। সব ঠিক আছে। আমি দেখে নিয়েছি। মিনুর অলস, নিস্তেজ উদ্দেশ্যহীন চোখের দিকে চেয়ে শ্যাম হেসে ফেলল–ভয় পাইয়ে দিয়েছিলি! কী চোখ তোর! বস্তুতঃ তখন শ্যামকে দেখছিল না মিনু, কিছুই দেখছিল না। তবু শ্যাম বুঝেছিল মিনু কতদূর দেখে, কতদূর দেখতে পায়। মিনু হাসে, ফিকে নিঃশব্দ হাসি। সে হাসিতে কোনো ইচ্ছে বা প্রাণ নেই। শ্যাম হঠাৎ টের পাচ্ছিল, যদিও তার টাকা ক'টা মিনুর জন্যই আজ বেঁচে গেল, তবু তার ভিতরে এতটুকু কৃতজ্ঞতাবোধ জাগছে না। মিনুকে সত্যিই আর ভালবাসে না বলে শ্যাম মনে মনে লজ্জা পেল। এ উচিত নয়, এ রকম হওয়া উচিত নয়। এই বিশ্রী ঠাণ্ডা সম্পর্ক কাটিয়ে দেওয়ার জন্য সে তাড়াতাড়ি বলল–মিনু, চা খাবি? চল, তোর সঙ্গে অনেককাল কথাবার্তা হয় না।

শ্যামের কথা শুনছিল না মিনু। সে হঠাৎ শ্যামকে ভুলে গিয়ে উপেক্ষা করে চকিতে ঝলসানো চোখে ডাইনে বাঁয়ে আর পিছু ফিরে কি যেন বিদ্যুৎগতিতে দেখে নিল। পরমুহূর্তেই আবার অলস ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে হাসল মিনু, পুলওভারটা টেনে কোমরের চওড়া বেল্টের যে সামান্য অংশ দেখা যাচ্ছিল তা ঢেকে দিল। বলল–আমি একা নই শ্যাম, আমার সঙ্গে লোক আছে। শ্যামের বুকের ভিতরে আবার গুরগুর শব্দ হচ্ছিল। মিনুর পিছনে হলদে রঙের গীর্জা বাড়ি, সামনেই বাস–ষ্টপে লোকের ভিড়, একটু সামনে একটা পার্ক–শীতের নিষ্পত্র গাছে কাক বসে

আছে, ধুলো-ময়লা মাখা ক্লান্ত মানুষেরা হেঁটে যাচ্ছে। এর মধ্যে কোথায় রয়েছে মিনুর লোকেরা, তা ভেবেও পেল না শ্যাম। সে জিজ্ঞেস করল—কোথায় তোর লোক? মিনু আবার হাসে, ভিড়ের মধ্যে মিশে আছে তুই দেখতে পাবি না। তার চেয়ে চল, তোকে এগিয়ে দিই, একটা ঠাণ্ডা বাসে উঠে চলে যাবি। শ্যাম বুঝতে পারছিল মিনুর একটা আলাদা সমাজ আছে, যেখানে সে শ্যামের মতো নীতিপরায়ণ লোকদের একেবারেই পাত্তা দেয় না। সেখানে সে মিনুর কাছে শিশু। ছেলেবেলায় মিনুর সঙ্গে তার কত গোপন কথার অংশীদারী ছিল। আর এতদিনে তার এবং এই প্রায় অচেনা মিনুরও আরো কত গোপন কথা তৈরি হয়ে গেছে, যার খবর কেউই আর রাখেনা। তবু শ্যাম চলে যেতে পারছিল না। তার মনে হল মিনুকে আরো কিছু ভাল কথা বলা দরকার যাতে মিনুর ভাল হয়। সে বলল, মিনু, তোর সঙ্গে আমার একটা কথা আছে। মিনু ভ্রূ কুঁচকে বলে, কি কথা! শ্যাম বিকারহীন গলায় বলে, আছে। মিনু ওর দুটি চোখের গভীর পর্যন্ত দেখে নিয়ে বলল, ঠিক আছে। একদিন তোর বাসায় যাবো। মাংস রাঁধবো দু'জনে। তারপর সারা দুপুর তোর কথা শোনা যাবে। শ্যাম মিনুকে দেখছিল না, সে লক্ষ্য করল অদূরে রাস্তার মোড়ে গীর্জার বাইরে রেলিঙে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে দু'জন লোক পাশাপাশি। তারা একবারও মিনু বা তার দিকে তাকাল না, চোখে রাস্তার দিকে চেয়ে রইল। তাদের পরনে সাধারণ ধুতি আর শার্ট, শার্টের হাতা গোটানো। হঠাৎ দেখে কিছুই মনে হয় না, সাধারণ চেহারার দুটি লোক। কিন্তু কেন যেন ওদের কোথাও মিল আছে। ওদের ঐ অলস ভঙ্গী লোককে দেখানোর জন্য। আসলে কোনো কাজে ওরা ভয়ঙ্কর রকমের নিপুণ। হঠাৎ শ্যাম মিনুর দিকে চেয়ে হাসল, তোর সঙ্গে ক'জন লোক মিনু? ঐ দুজন তো! বলে আঙুল তুলে লোক দুটোকে দেখায় শ্যাম। তড়িৎগতিতে মিনু তার দীর্ঘ শক্ত হাতে শ্যামের হাত টেনে সরিয়ে দিয়ে বলে, আঙুল দেখাস না। সামান্য চঞ্চল দেখায় মিনুকে, তবু সে মুখে হাসি টেনে বলে, ওই দু'জন। আরো চারজন আছে। তোর বেশ চোখ আছে শ্যাম! কিন্তু এবার তুই বাড়ি যা। শ্যাম সামান্য মজা পেয়ে হেসে উঠে বলল, দাঁড়া, মিনু। তারপর যেন মিনুর দেওয়া কোনো ধাঁধার উত্তর খুঁজছে ঠিক এভাবে সাবধানে চারদিকে তাকাতে তাকাতে বলে, আরো চারজনকে আমি ঠিক খুঁজে বের করব। মিনু শক্ত হাতে তার কাঁধ ধরে বলল, তোকে খুঁজতে হবে না, আমার সঙ্গে একটু হেঁটে আয়, দেখিয়ে দিচ্ছি। বলে তার দিকে পিছু ফিরে মিনু হেঁটে যেতে লাগল দীর্ঘ শ্রথ পায়ে। শ্যাম পিছু নিল। দু-চার পা হেঁটেই মিনু দাঁড়াল, পিছু ফিরে শ্যামকে বলল—দ্যাখ। শ্যাম মিনুর পাশে এসে দাঁড়িয়ে বলল, কোথায়! মিনু মাথা হেলিয়ে রাস্তার ওপারে ফুটপাথটা দেখিয়ে বলল, ও পাশে চায়ের দোকানটার সামনে দ্যাখ দুটো ছেলে দাঁড়িয়ে আছে, একজন বেঁটে, গায়ে সুরকি রঙের পুলওভার, প্যান্টের পকেটে হাত, অন্যজন লম্বা চওড়া স্বাস্থ্যবান, গায়ে গোল-গলা গেঞ্জী, পরনে আমার মতো কালো প্যান্ট। শ্যাম আস্তে আস্তে বুঝতে পারে বিশেষ কারো জন্যে এই ফাঁদ পাতা হয়েছে। তার হাত পা অবশ হয়ে আসে, তবু প্রাণপণে নিজের গলার স্বর স্বাভাবিক রেখে বলল, আর দুজন? মিনু লম্বা মাপা পায়ে সরে গেল, এদিকে আয়। যেভাবে লোকে নিজের ঘরবাড়ি নতুন অতিথিকে দেখায় তেমন স্বাভাবিক ভঙ্গী তার। পার্কটার কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়ে মিনু দেখাল পার্কের গায়ে একটা গলি। নিঃশব্দে আবার হাসে মিনু, যাকে ধরা হচ্ছে আজ সে ঐ গলিতে থাকে। গলির মুখে দ্যাখ একটা ট্যাক্সি, মিটার ডাউন করা। পিছনের সীটে একজন, তাকে এখান থেকে ভাল দেখা যাচ্ছে না। গভীর শ্বাস টেনে শ্যাম বলে, আর একজন? মিনু মাথা নাড়ে, আর একজন এখানে নেই, সে আমাদের মক্কেলকে নিয়ে আসতে গেছে। ভুলিয়ে-ভালিয়ে আনবে। শ্যামের মাথার ভিতরটা ধোঁয়াটে লাগে, থরথর করে কাঁপে তার পা। মনে হয় এই খানে এই ভিড়ের মধ্যে মিনু অলক্ষ্যে এক স্টেজ খাড়া করেছে, যেখানে এক্ষুণি একটা নাটক হবে; কিংবা নাটকও নয়, কেননা মিনুর এইসব ব্যাপার নিশ্চিত কিছু সত্যিকারের রক্তপাত ঘটে যায়। তবু কাষ্ঠ-হাসি হেসে সে বলে, মিনু, তোরা কাকে ধরছিস? মিনু হাসে না আর; তার ভ্রূ সামান্য কোঁচকানো, তীব্র চোখ তবু তাকে এই মুহূর্তে খুব ভয়ঙ্কর দেখায় না। যেন খানিকটা অসহায়ের মতো ঠোঁট উল্টে বলে, কি জানি! তাকে চিনিও না। শ্যাম যেন আপন

মনেই নিজেকে প্রশ্ন করে,তবে? মিনু তার কপালের ওপর একটা চুলের ঘুরলি আঙুলে জড়ায়, কেমন অন্যমনস্ক এবং আবার উদাসীন দেখায় তাকে। কিছুক্ষণ পরে সে শ্যামের দিকে চেয়ে বলে, বাড়ি যা শ্যাম। আবার দেখা হবে। শ্যাম কোনো কথা না বলে মিনুর দিকে পিছন ফিরে হাঁটতে থাকে, কিছুদূর গিয়ে কেমন চমকে সে ফিরে তাকায় , মিনু তার দিকে চেয়ে আছে। অস্বস্তির চোখ। শ্যাম ফিরে আসে আবার, মিনু, এই দু'জন তোর বন্ধু? যেন বা সে প্রশ্ন করতে চায়–এই দু'জন মিনুর কেমন বন্ধু, যেমন বন্ধু সে একদিন মিনুর ছিল! মিনু সকৌতুকে তার দিকে চেয়ে দেখে, তারপর মাথা নেড়ে জানায়–হ্যাঁ। শ্যামের কেমন বমি বমি করছিল, সব কিছু ভাল করে লক্ষ্য করার মতো মনের অবস্থা ছিল না, তবু সে লক্ষ্য করল মিনুর মুখে চোখে একটা অসহায় দ্বিধার ভাব। শ্যাম মাথা নেড়ে মিনুকে জনাল যে, সে বুঝতে পেরেছে। তারপর বলল-আচ্ছা মিনু ,চলি। মিনু আস্তে মাথা নাড়ে–আচ্ছা। শ্যাম বলে–তাহলে একদিন আসছিস তো! ছুটির দিনে আসিস। মিনু মাথা নাড়ে আবার হ্যাঁ। তারপর হেসে ঠাট্টার ছলে বলে, যদি ততদিন থাকি। এই কথাটুকুই যেন ধাক্কা দিয়ে শ্যামকে মিনুর কাছ থেকে সরিয়ে দেয়। সে দ্রুত বাস-স্টপের দিকে হাঁটতে থাকে। পিছু ফিরে আর তাকায় না।

গীর্জার রেলিঙের গায়ে হেলান দিয়ে সেইরকম উদাসীন ভঙ্গীতেই লোক দুটো দাঁড়িয়ে আছে। তারা দুজনেই অবহেলার চোখে শ্যামকে এক পলক দেখে নেয়। শ্যাম তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, বাস-স্টপে এসে দাঁড়ায় গা-ঘেঁষা এক পাল লোকের ভিড়ের মধ্যে। শীত নেই তেমন, তবু শ্যামের হাত-পা-ঘাড়ে কেমন ঠাণ্ডা লাগছিল। বুকের ভিতরে সেই দুড়দুড় শব্দ –কে যেন দৌড়ে যাচ্ছে, কে যেন পালিয়ে যাচ্ছে বুকের ভিতরে। তার শ্বাসকষ্ট হতে থাকে। তখন মাঝে মাঝে শ্যামের এরকম হত। বুক কাঁপা তার পুরোনো রোগ। বাস স্টপের ভিড়, পিছনে দোকানের আলো, ডান দিকে বাঁদিকে কয়েকটা ম্যাড়ম্যাড়ে গাছ–সব কিছুই বড় নিষ্প্রাণ। এই তো একটু আগে সে অফিস থেকে বেরিয়েছে, ভিড়ে ঠেলাঠেলি করে বাসে উঠেছে, তারপর মিনু তাকে টেনে নামাল–ততক্ষণ পর্যন্ত সব কিছু স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু এখন হাতে পায়ে জড়ানো শীত, কাঁপা বুক আর অনিশ্চিত একটা উদ্বেগের ভিতরে দাঁড়িয়ে থেকে তার হঠাৎ মনে হচ্ছিল, বাস্তবিক এ শহর তার চেনা নয়। যেমন তার চেনা নয় তার ছেলেবেলার বন্ধু কিংবা তার দু'জন সঙ্গী।

মিনুর জন্যেই সেদিনকার বিকেলটা তার বিস্বাদ হয়ে গিয়েছিল। বাসে উঠবার পরও সে সতর্ক হবার চেষ্টা করেনি। হ্যান্ডেল ধরে ঝুলছিল, টের পাচ্ছিল তাকে ঘিরে অনেক হাত। কোন্‌টার কোন্ উদ্দেশ্য তা বুঝবার চেষ্টাও করেনি সে।

তারপর অনেকদিন ভিড়ের ভিতরে সন্ত্রস্ত চোখে সে চেয়ে থেকেছে। মনে হয়েছে, এদের ভিতরে রুক্ষ চেহারার দয়াহীন কিছু লোক গা-ঢাকা দিয়ে ধারালো কঠিন চোখে তাকে লক্ষ্য রাখছে। দৌড় দৌড়-বুকের ভিতরে সেই শব্দ শোনা যেত। যেন অদূরেই কোথাও মিনুর সেই ছয়জন সঙ্গী বাতাসের সঙ্গে মিশে নিঃশব্দে অপেক্ষায় আছে। অথচ সে জানত যে, এ ভয় অকারণ। বস্তুতঃ এতই নিরীহ, নিরামিষ তার জীবন যে, সে কারও ভয়ঙ্কর কোনো ক্ষতি করারও ক্ষমতা রাখে না। তবে কি কারণে তার ওপর ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ নেওয়া হবে?

তেইশ চব্বিশ বছর বয়সের সেই ভীতু অথচ দয়ালু শ্যামের সঙ্গে কারো কোনোদিনই আর দেখা হবে না। মনে পড়তেই শ্যাম নিজেও মৃদু একটু হাসল স্টেটবাসের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে সে ভিড়ের মধ্যে যেন সেই শ্যামকে হেঁটে যেতে দেখল, দেখল শ্যাম মোড়ের ভিখিরির বাটিতে ফেলে দিচ্ছে একটা দুটো পয়সা , ঠনঠনে পেরিয়ে যাওয়ার সময় সবার অলক্ষ্যে একটু মাথা নীচু করে দ্রুত একবার হাত দুটো জোড় করেই সরিয়ে নিচ্ছে, কিংবা বাসের দরজায় ধরা পড়েছে পকেটমার–সেই ভিড় থেকে দ্রুত পায়ে পালিয়ে যাচ্ছে নিরাপদ গলির মধ্যে। ভাবতে ভাবতে শ্যাম মৃদু হেসে মনে মনে বলল–ওঃ শ্যাম দি কাইণ্ডহার্টেড!

অনেককাল মিনুর সঙ্গে আর দেখা হয় না। কারণ, ক্রমে ক্রমে শ্যামের চাকরি গেল পাল্টে,

তার চলাফেরা সীমাবদ্ধ হয়ে গেল কয়েকটা বাছাই করা রাস্তায়, অফিস-রেস্তরাঁ-বার কিংবা দক্ষিণের ভাল পাড়ায় তার ছোট্ট একটেরে ঘরটা—এইটুকুর মধ্যেই সুখে আটকে ছিল শ্যাম। আর মিনু ঘুরে বেড়ায় নোংরা গলি ঘুঁজি, চোরা চায়ের দোকান, চোলাই কিংবা জুয়ার আড্ডায়, পারুল কিংবা চাঁপার ঘরে। কাছাকাছিই ছিল তারা; তবু দুটো আলাদা শহরে। একটার ভিতরে আর একটা কিংবা আরো অনেকগুলো কলকাতা পোরা আছে। তারা দু'জনেই যে এক শহরে বাস করে, তা নয়। যেমন স্টেটবাসের ডানধারে বসে সে একরকম দেখছে, বাঁ ধারে বসলে দেখাতো অন্যরকম, পাঁচতলার ছাদ থেকে যেমন দেখা যায়, ম্যানহোলের ভিতর থেকে মাথা তুলে দেখলে তেমন নয়। আসলে দিকের তফাত, উঁচু কিংবা নীচু থেকে দেখার তফাত, এক এক রকম কলকাতা অন্যরকমের কলকাতার ভিতরে ঢুকে আছে। তার ইচ্ছে করছিল এখন গিয়ে একবার মিনুর মুখোমুখি দাঁড়ায়। তার কাঁধে চাপড় মেরে বলে, আঃ হাঃ মিনু! কেমন আছিস গুরু? তারপর গলা নামিয়ে বলে, আমাকে দলে নিবি গুরু? দেখিস শালা, আমি দু'হাতে চালাব মেশিন কিংবা পাঞ্চ, তলপেটে ছোরা ঢোকাবো যেন মাখনে, দেখে নিস গুরু কেমন পকাপক চলে সোডার বোতল! তারপর গিয়ে বসে গোপন আস্তানায় চায়ের দোকনের পিছনে অন্ধকার অলিগলির মধ্যে, যেখানে ভয়ঙ্কর সব যুবতীদের ছবিওলা ক্যালেন্ডার ঝোলে দেয়ালে, আর ভোমা নীলমাছি উড়বার শব্দ। সমানে সমানে মিনুর মুখোমুখি বসে অন্তরঙ্গ সুরে মিনুকে বলতে ইচ্ছে করে—কি চলবে গুরু? ঝিট মানে গাঁজা, আর অ্যান্টিক হচ্ছে চোলাই। নেশা জমে এলে আস্তে আস্তে মাথা নাড়বে শ্যাম—না গুরু, তুই ঢস্‌কে গেছিস। তোর বয়স গুরু হয়ে গেছে। আমার চেয়ে তুই বছর ছয়েকের বড়, আমার এখন বত্রিশ বোধ হয়। তাহলে তোর-যাকগে শালা, এখন কি চলছে তোর? ছিনতাই, না এক-দুশোর কেপমারী? বোর্ডে ধরিয়েছিস? চাঁপার ঝাঁপিতে কত গেছে রে শালা! ওরা তো ক্যাশমেমো দেয় না, দিলে ক'হাজারে দাঁড়াতো গুরু? ভাবিস না, ভাবিস না মিনু, আমি তোর দিনকাল ফিরিয়ে আনবো। উঠতি ছোকরার মতো আমার রক্ত গরম, বুড়োর মতো ঠাণ্ডা মাথা, গোয়েন্দার মতো চোখ। যে কোনোভাবে বাঁচতে বা যে কোনোভাবে মরতে আমি তৈরি—আঃ গুরু, কি বলবো তোকে, একটা উইক পয়েন্টে আমি মার খেয়ে গেছি জোর, মা-বাপ তোলা একটা গালাগাল আমি সইতে পারলুম না—

পাশের লোকটি সামান্য ঝুঁকে পড়ে বলল, কিছু বলছেন?

ভয়ঙ্কর চমকে উঠল শ্যাম। বুঝতে পারল, সে বে-খেয়ালে হঠাৎ কথা বলে উঠেছিল। বাসের সামনের বা পিছনের সীটের দু-একজন তার দিকে ফিরে দেখল। বিবেকানন্দ রোডের কাছে ভিড় ঠেলে নেমে গেল শ্যাম।

।। ২ ।।

খুব সকালবেলা দরজার ধাক্কা শুনে ঘুম ভাঙল শ্যামের। উঠে দরজা খুলে দেখল, ইতু।

—ইতু!

—শ্যাম!

এক ঝলক সাদার মধ্যে ইতু দাঁড়িয়ে আছে। তার শাড়ি সাদা, ব্লাউজ সাদা, হাতের ব্যাগটি সাদা, এমন কি তার কপালেও শ্বেত চন্দনের টিপ। শ্যামের ঘুম জড়ানো চোখে সেই সাদা রঙ কট কট করে লাগে। চোখ পিট পিট করে সে হেসে বলল—হাতের বীণাটি কোথায় রেখে এলে!

জানালা দিয়ে ঘরে আসছে রাদ, তার আভায় ইতুকে সুন্দর এবং গম্ভীর দেখায়। ইতু দরজার চৌকাঠ ডিঙিয়ে না, ওপাশ থেকেই বলে—তোমার ঘরটা একটু গুছিয়ে নাও শ্যাম। এই বিশ্রী ঘরে কোনো ভদ্রমহিলা আসতে পারে না।

শ্যাম তাড়াতাড়ি তার বসবার চেয়ারটা একটু টেনে আনে ঘরের মাঝখানে, পা দিয়ে সরিয়ে দেয় কয়েকখানা বই, বিছানার লেপটা জড়ো করে রাখে পায়ের দিকে, বলে—তুমি আসবে জানলে আগে থেকেই গুছিয়ে রাখতুম। চেয়ারটা দেখিয়ে বলে—বোসো ইতু।

ইতু চেয়ারে বসে না। হাতের ব্যাগটা ছুঁড়ে ফেলে বিছানায়, তারপর বালিশ টেনে নিয়ে কনুইয়ের ভর রেখে আধশোয়া হয়। বলে–মুখটুখ যা ধোয়ার ধুয়ে এসো, আমি আজ সারারদিন থাকবো এখানে।

শ্যাম হাসে।

ভ্রূ কুঁচকে ইতু বলে–তুমি টেলিফোনে আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলে শ্যাম?

শ্যাম মাথা নাড়ে–হ্যাঁ।

–আমি রাজী হয়েছিলুম?

শ্যাম আবার মাথা নাড়ে–হ্যাঁ।

–আর কথার মাঝখানে তুমি টেলিফোন রেখে দিয়েছিলে?

শ্যাম লাজুক গলায় বলে –হু।

সামান্য দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে ইতু–তুমি কী চাও?

কথা না বলে শ্যাম তাক থেকে তার টুথব্রাশ তুলে নেয়। বাথরুমের দরজায় পা দিয়ে বলে–বোসো ইতু, আমি তোমাকে চা করে খাওয়াবো। তারপর দরজা বন্ধ করে দেয়।

বাথরুমে ঢুকে সে খানিকক্ষণ শূন্য চোখে সামনের সাদা দেয়ালটার দিকে চেয়ে থাকে। সারা শরীরে এখন গভীর আলস্য, কোনোখানে এতটুকু উত্তেজনা নেই, আশ্চর্য! সে কল খুলে ঠাণ্ডা জলের মধ্যে হাত রাখে, হাসে, মনোযোগ দিয়ে জল পড়ার কলকল শব্দ শোনে কিছুক্ষণ, তারপর মন্থর হাতে পেস্ট-এর টিউব খুলতে থাকে।

আধঘন্টা পর বেরিয়ে এসে সে নীরবে স্টোভ জ্বালে, এতকাল ব্যবহার না-করা চা-চিনির কৌটো নামায় তাক থেকে। জমানো দুধের কৌটোয় ঝাঁকানি দিয়ে দেখে, তারপর কৌটোর ফুটোয় চোখ রেখে ভিতরটা দেখে নিয়ে ইতুর দিকে চেয়ে হেসে মাথা নাড়ে–চা হবে না। দুধ শুকিয়ে গেছে।

–কী শুকিয়ে গেছে?

শ্যাম কৌটো দেখিয়ে বলে–দুধ।

ইতু সামান্য হাসে– দি মিল্ক অব হিউম্যান কাইন্ডনেস?

খুব জোরে হেসে উঠতে গিয়েও হাসে না শ্যাম, স্মিতমুখে বলে–আঃ! ইতু, তোমার বুদ্ধি বেড়ে গেছে।

–তোমাকে চা করতে হবে না শ্যাম। তুমি আমার কাছে এসো।

শ্যাম কৌটোটা মেঝের ওপর খটাস করে ফেলে দিয়ে ঘুরে দাঁড়ায়, আস্তে আস্তে জানালার দিকে সরে যেতে থাকে।

–এসো শ্যাম। শান্ত গলায় ইতু বলে।

শ্যাম জানালার চৌকাঠে হাত রেখে রোদে পিঠ আর ইতুর দিকে মুখ রেখে দাঁড়ায়। হেসে বলে–ইতু, তোমাকে খুব পবিত্র দেখাচ্ছে।

–আমি তা জানি।

–আরো কিছুক্ষণ তোমাকে পবিত্র দেখাক। তারপর–

ইতু দাঁতে দাঁত চেপে বলে–তারপর কী?

ইতু মাথা নাড়ে–না। দি মর্নিং শোজ দি ডে। কাছে এসো শ্যামা। আমি তোমার সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে চাই।

শ্যাম মৃদু ম্লান হাসে– তোমার বুদ্ধি বেড়ে গেছে ইতু।

–কাছে এসো শ্যাম। তোমাকে একবার ছুঁলেই আমি বুঝতে পারবো তোমার কি হয়েছে।

যেন নিজের ছেলেকে কাছে ডাকছে এমনি মায়ের মতো আদুরে শোনায় ইতুর গলা। চোখে মুখে বলতে চাইছে–তোমার সব দুষ্টুমি ধরে ফেলেছি।

শ্যাম কাছে আসে না, জানালার কাছ থেকেই বলে–কী করে বুঝলে!

–কাছে এসো, আমাকে ছুঁতে দাও। তারপর দ্যাখো বলতে পারি কিনা!

শ্যাম ধীরে ধীরে দু'পা এগোয়, হাসিমুখে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলে–ছোঁও।

ইতুর হাত এগিয়ে আসতেই শ্যাম হাত সরিয়ে নিয়ে অন্যখানে রেখে বলে–ছোঁও।

আঃ শ্যাম! বলতে বলতে ইতু হাত বাড়ায়।

শ্যাম হাত সরিয়ে নিয়ে অন্যদিকে বাড়িয়ে বলে–এবার ছোঁও।

–কি হচ্ছে? বলে ঠোঁটে হাসিচেপে উঠবার উপক্রম করে ইতু।

–উঠো না ইতু। শ্যাম এক পা এগিয়ে আসে, বলে–ছোঁও।

হাতের নাগালে শ্যামাকে পেয়ে ইতু আবার বসে পড়ে, তার পর ঝুঁকে পড়ে হঠাৎ শ্যামের শার্টটা ধরার চেষ্টা করে।

তড়িৎগতিতে লঘু পায়ে সরে যায় শ্যাম, হাসে–ধরবে? তারপর জানালার আরো কাছে সরে গিয়ে বলে–ধরো তো দেখি?

–আঃ শ্যাম! কাছে এসো।

–তুমি এসো ইতু। শ্যাম গা ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

–তোমার ভয় কী শ্যাম! তুমি অনেক মেয়েকে ছুঁয়েছো। তুমি পাকা লম্পট।

শ্যাম মাথা নাড়ে–ঠিক।

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায় ইতু–ভয় কী শ্যাম!

ইতু কাছে এসে তার কাঁধের দিকে হাত বাড়ায়। শ্যাম মৃদু হাসিমুখে আস্তে আস্তে নুইয়ে দেয় কাঁধ। ইতু ফিসফিস করে বলে–ভয় কী শ্যাম! ভয় কী!

ইতুর হাত নরমভাবে কাঁধের ওপর নেমে আসছে, এক্ষুনি ছুঁয়ে ফেলবে তাকে, শ্যাম আরো নীচু হয়, তারপর পিছল গতিতে ইতুর হাতের তলা থেকে সরে যায় ঘরের মাঝখানে। ইতুর হাত খানিকটা শূন্য থেকে ধপ করে নেমে আসে, দুটো কাচের চুড়ির ঝনাৎ শব্দ হয়। সে ঘুরে ভ্রু কুঁচকে শ্যামের দিকে তাকায়।

–ধরো তো দেখি! শ্যাম হাসে। ইতুর দিকে খেলার ছলে একখানা হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলে ছোঁও তো দেখি!

কিছুক্ষণ কুঁচকে চেয়ে থেকে হঠাৎ মৃদু হাসে ইতু। বলে, তুমি খেলতে চাও?

শ্যাম মাথা নাড়ে–হ্যাঁ।

–ঠিক আছে। ইতু পলকের মধ্যে তার শাড়ির আঁচল কোমরে জড়িয়ে নেয়–ছুঁতে পারলে আমার জিত!

–জিত!

শ্যাম দরজা বন্ধ করে দেয়।

মুখোমুখি দুজন একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। ইতুর শরীর ভারী হয়ে গেছে অনেক। কোমরে আঁচল জড়ানোর পর এখন দেখা যাচ্ছে তার তলপেটে চর্বির একটু ঢিবি। হাতে গলায় মাংসের খাঁজ। তবু শ্যাম জানে ইতু নাচ শিখতো। তাই সে সতর্ক হয়।

ইতু সোজা এগোয় না, হাল্কা পায়ে দেয়ালের দিকে সরে গিয়ে ঘুরে আসতে থাকে। হাসে। শ্যাম চটুল পায়ে উল্টো দিকে ঘুরে যায়, বলে–বাক্ আপ, ইতু।

ইতু হাসে। ঘুরতে থাকে। শ্যাম ঘুরতে থাকে। ঘরের সবকিছুই শ্যামের চেনা। দরজার দিকে গেলে তার ডানধারে চৌকি, মাঝখানে চেয়ার, বাঁ ধারে স্টোভ জ্বলছে। জানালার দিকে গেলে ঠিক উল্টো। একধারে স্তূপ হয়ে থাকা বই। একটা মোটা বই মেঝের ভিতরে এগিয়ে আছে। শ্যাম বইটা পেরিয়ে যায়, চৌকির পাশ দিয়ে মন্থর গতিতে সরে যায়, চেয়ারটায় একবার হাত রাখে। ডান ধারে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ থেমে বিদ্যুৎগতিতে সোজা এগিয়ে আসে। সাপের ছোবলের মতো তার হাত ছুটে আসে শ্যামের বুকের দিকে। অল্পের জন্য এড়িয়ে যায় শ্যাম, লাফিয়ে উঠে যায় চৌকিতে, দরজার দিকে লাফ দিয়ে নামে। হাসে। বাঁ দিক ঘুরতে থাকে।

ইতু দাঁড়িয়ে পড়ে হঠাৎ–এই, কী হচ্ছে ছেলেমানুষী!

শ্যাম দাঁড়ায়, দূর থেকে বলে–ছুঁতে পারলে তোমার জিত।

–আমি জিত চাই না। তুমি কাছে এসো।

–খেলার নিয়ম ভেঙো না ইতু। শ্যাম বলে– খেলে জেতো।

ইতু বিছানায় বসে পা নাচায়–আচ্ছা, ছুঁতে চাই না তোমাকে।

শ্যাম দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরায়। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। ইতু ঠোঁট টিপে হাসে, অন্যদিকে চোখ রাখে, তারপর হঠাৎ লাফিয়ে উঠে এগিয়ে আসে। শ্যাম চমকে সরে যেতে গিয়ে কষ্টে স্টোভটার ওপর পড়ে যাওয়া থেকে নিজেকে বাঁচায়। জানালার চৌকাঠে ভর দিয়ে সরে যায়, বলে–আঃ ইতু, তোমার বুদ্ধি বেড়ে গেছে। তোমার উন্নতির আর দেরী নেই।

সিগারেটটা পড়ে গিয়েছিল মুখ থেকে, ইতু সেই জ্বলন্ত সিগারেট তুলে নিয়ে তার দিকে ছুঁড়ে মারে। বিছানায় পড়লে শ্যাম সেটাকে তুলে নিয়ে বলে–থ্যাঙ্ক ইউ।

ইতু বেপরোয়াভাবে চেয়ারটাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়, কপালের ওপর থেকে কুঁচো চুল সরায়, সোজা এগিয়ে আসে। শ্যাম নীচু হয়ে তার পাশ দিয়ে, খুব কাছে দিয়ে উল্টোদিকে চলে যায়, বলে–ঠাণ্ডা মাথায় খেলো, রেগে গেলে শুধু ঘুরে মরতে হবে।

ইতু সে কথা শোনে না। সে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে এগিয়ে আসবার চেষ্টা করে। অন্ধের মতো সে পর পর চেয়ার চৌকি এবং দেয়ালে ধাক্কা খায়, মেঝের মোটা বইটাতে হোঁচট খেয়ে সামলে যায়। রাগে দাঁত দিয়ে ঠোঁট চাপে। তার মুখলাল হয়ে আসে, মুখে ঘাম চিকমিক করে ওঠে।

অল্প একটু উত্তেজনা বোধ করে শ্যাম। খেলা তাকে পেয়ে বসে। হাল্কা গলায় সে বলে–খেল ইতু, খেল। তোমাকে এখন আরো সুন্দর দেখাচ্ছে।

বিছানার কাছে ইতু একটু থেমে যায়। হাত ব্যাগটা তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারে শ্যামের দিকে। শ্যাম মাথা নীচু করলে সেটা দেয়ালে লাগে, তরপর সোজা নেমে সে স্টোভের ওপর থেকে কেটলীটা উল্টে দেয়। দপ করে স্টেভের আগুন ওপরে ওঠে, কেটলীর জল মেঝে ভাসিয়ে দিতে থকে। শ্যাম তার চেনা ঘরের নিরাপদ কোণে সরে যায়।

ইতু একটানে চেয়ারটাকে সরিয়ে দেয়, মেঝের ঘরম জল লাফ দিয়ে পার হতে যায়। পুরো টাল সামলাতে পারে না। দেয়াল ধরে দাঁড়িয়ে হাঁফায়, বলে–শ্যাম, আমাকে আর কষ্ট দিও না।

ইতুকে হঠাৎ খুব বিবর্ণ দেখাচ্ছিল। কোমরের আঁচল খুলে স্টোভের ওপর ঝুলছে।

শ্যাম বলে–থেমো না ইতু, খেল। খেলে যাও। তারপর হাত বাড়িয়ে বলে।–এই তো আমি! ছোঁও!

শ্যাম হাসে, দূরে সরে যায়, লাফ দিয়ে ওঠে চৌকির ওপর–এসো ইতু, খেল, নইলে এক্ষুণি আবার আমি ঝিমিয়ে পড়ব।

ইতু তবু দাঁড়িয়ে থাকে, বলে–আমি আর পারছি না, শ্যাম।

–পারবে। শ্যাম হাসে– ঠাণ্ডা হয়ে বসে থেকে কী লাভ! খেল।

ইতু শ্লথ পায়ে এগোয়। শ্যাম সরে সরে যায়। তারপর চেয়ারটার চারদিকে তারা ঘুরপাক খায়। বড় বড় শ্বাসের শব্দে ভরে ওঠে ঘর। তবু শ্যাম হাসে, ইতুকে থামতে দেয় না। ইতু প্রাণপণে চেষ্টা করে। শ্যাম ঘুরে ঘুরে চৌকির ওপর ওঠে, জানালার ধারে চলে যায়, দেয়ালের দিকে সরে আসে, গরম জলের স্রোত লাফিয়ে পার হয়। লক্ষ্য করে, ইতু দু'হাত বাড়িয়ে অন্ধের মতো ঘুরছে, শ্যাম যেদিকে তার উল্টো দিকে যাচ্ছে। শ্যাম শিস দিয়ে জানিয়ে দেয় সে কোন্‌দিকে আছে।

শ্যাম হাসে, শ্বাসের সঙ্গে বিড়বিড় করে বলে–খেল ইতু, খেল। তোমাকে একটু ভাল লাগতে দাও। আমার শরীর গরম হচ্ছে না ইতু, বহুকাল ধরে আমি ঠাণ্ডা হয়ে আছি। খেল ইতু, খেলে আমাকে ছোঁও। তারপর তোমার জিত। আঃ ইতু, তুমি মোটা হয়ে গেছ একটু, পেটে চর্বি জমছে, বয়সও হয়ে এল। সময় থাকতে থাকতে খেলে নাও, বুড়ো হয়ে যাওয়ার আগে খেলে

নাও ...মরে যাওয়ার আগে খেলে নাও.... সব কিছু সহজে পেতে নেই, পাওয়া উচিত নয়... এতকাল তোমাকে বড় সহজেই পেয়ে যেতুম, তাই তুমি আমাকে সবচেয়ে কম লাভবান করেছো। ... আঃ এত সহজে হাল ছেড়ে দিও না .. থেমো না.. থামলেই তুমি দুয়ো..থামলেই তুমি বুড়ো...থামলেই তুমি মাটির ঢেলা ...ঘোরো, ঘুরতে থাকো .....ঘুরতে ঘুরতে ছায়া হয়ে যাও ইতু.....মায়াবিনী হয়ে যাও ....রহস্যময়ী হয়ে যাও..... দুপ্রাপ্য হয়ে যাও.. রহস্যময়ী হয়ে যাও... দুষ্প্রাপ্য হয়ে যাও.... আমি যেন ভিখিরির মতো তোমাকে কামনা করি... আমি যেন হাঁটু গেড়ে বসি তোমার জন্য... আমি যেন তোমার জন্য পাগল হতে পারি.... অ॰ হাঃ ইতু, তুমি স্টোভের বড় কাছে গেছ.... ধীর হয়ে গেছে তোমার পা... আবার তোমার আঁচল খুলে দুলছে আগুনের ওপর ... ওঃ ইতু!

বড় হতাশ হয় শ্যাম। থেমে যায়। দাঁড়িয়ে দেখে, ইতুর আঁচল দপ করে জ্বলে উঠল।

–ওঃ শ্যাম! হাঁফাতে হাঁফাতে কেঁদে ওঠে ইতু–আমি কী করব শ্যাম!

ইতু তার আঁচল আলগা করে ধরে শ্যামের দিকে আসতে থাকে। শ্যাম। সরে যায়।

–ওঃ শ্যাম!

শ্যাম মাথা নাড়ে–আমি খেলার নিয়ম ভাঙি না ইতু।

–কী করব শ্যাম!

শ্যাম বিছানা থেকে লেপটা তুলে নিয়ে ছুঁড়ে দিয়ে বলে–এটা দিয়ে চাপা দাও।

ইতু মেঝেতে উবু হয়ে বসে। লেপ চাপা দিয়ে আগুন নেভায়। আঁচলটা সবে ধরেছিল, নেভাতে কষ্ট হয় না। শ্যাম দূরে দাঁড়িয়ে দেখে।

ধীরে ধীরে মুখ তোলে ইতু। শূন্য চোখে চেয়ে থাকে। তারপর পোড়া আঁচল কুড়িয়ে নিয়ে শ্যামের বিছানায় এসে বসে। হাঁফায়।

ব্যাগটা তুলে নিয়ে বিছানায় ছুঁড়ে দেয় শ্যাম। ইতু চমকে ওঠে। তারপর যেন ঘুম এবং স্বপ্ন থেকে জেগে উঠে ব্যাগটা হাতে তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়ায় ইতু। দরজার কাছে গিয়ে একটু থামে, বলে– তোমার বিছানাটা স্যাঁতস্যাঁতে শ্যাম, রোদে দিও।

শ্যাম মাথা নাড়ে–আচ্ছা।

–তুমি অনেকদিন দাড়ি কামাওনি।

শ্যাম মাথা নাড়ে–হ্যাঁ।

–তুমি অনেক রোগা হয়ে গেছ।

শ্যাম হাসে–হ্যাঁ।

–চলি শ্যাম।

–আচ্ছা।

শ্যাম দেখে, ছোট্ট, ছোট্ট প্যাসেজটা পার হয়ে সিঁড়ির দিকে চলে যাচ্ছে ইতু। পিঠে পোড় আঁচল। একবার তার ইচ্ছে হয় ইতুকে ডেকে বলে– কাপড়টা ফিরিয়ে পরে যাও। পরমুহূর্তেই ভাবে থাক। কেননা তার মনে হয়, ইতুকে বড় সুন্দর দেখাচ্ছে।

।। ৩ ।।

–আপনি খেলোয়াড় ছিলেন?

–হ্যাঁ।

–কী খেলতেন আপনি?

চেয়ারে সামান্য শব্দ করে উঠে দাঁড়ায় শ্যাম–ব্যাগাটেলি আর ক্যারম।

লোকটা তাড়াতাড়ি নিজের চশমায় হাত দিয়ে টেবিলের কাগজপত্রের দিকে তাকায়–কই এখানে লিখেছেন ক্রিকেট আর ফুটবল।

শ্যাম টেবিলের ওপর ঝুঁকে বলে –দেন হোয়াই ডু ইউ আস্‌ক!

লোকটা অবাক চোখে শ্যামকে একটু দেখে নিয়ে বলে–ওঃ! আচ্ছা, আপনি বসুন।

শ্যাম আবার বসে পড়ে। তার গাল গলা ভয়ঙ্কর চুলকোচ্ছিল, অনেকদিন পর গায়ে ক্ষুর পড়ায় দাড়ির গোড়া ফুলে উঠেছে। সে গালে হাত বোলাতে থাকে। লম্বা সেক্রেট্যারিয়েট টেবিলের ওপাশে তিনজন। এ পাশে শ্যাম একা। দু'ধারে দু'জনের দিকে তাকায় না শ্যাম। মাঝখানে তার মুখোমুখি অল্পবয়সী যে লোকটি বসে আছে তার দিকেই চেয়ে থাকে। লোকটি কাগজপত্র থেকে আবার মুখ তোলে এবং প্রশ্ন করে–কভার পয়েন্টটা কোন্ অঞ্চল তা ডায়াগ্রাম না দেখিয়ে শুধু মুখে বুঝিয়ে দিন তো!

শ্যাম টেবিলের নীচে সামান্য পা নাচায়; নির্বিকারভাবে বলে–ভুলে গিছি।

লোকটা আবার মুখ খোলে, কথা বেরোবার আগেই শ্যাম তাড়াতাড়ি বলে–আমি সিভিল ড্রাফটস্‌ম্যান, আমার খেলা দিয়ে আপনারা কী করবেন?

লোকটা হতাশভাবে চেয়ারের পিছনে ঠেস দেয়, মুখের ওপর আড়াআড়িভাবে তুলে ধরে একটি পেন্সিল, তারপর চিন্তান্বিতভাবে তার দিকে চেয়ে থাকে।

এইবার ডানদিক থেকে ইংরিজিতে প্রশ্ন আসে–হু ইজ ডীন রাস্ক?

শ্যাম এতক্ষণে দেখে লোকটাকে। আধবুড়ো মাথায় টাক, মোটা গোঁফ আর ঠাণ্ডা কুটনৈতিক হাসি তার মুখে।

শ্যাম মাথা ঠাণ্ডা রেখে বলে আমি রিপোর্টার নই। তারপর কোলে রাখা ড্রইংয়ের ফাইলটা তুলে টেবিলে রাখে–তোমরা আমার ড্রইং দেখেছো।

লোকটা তেমনি ঠাণ্ডা হাসি হাসে– আমরা একজন আপ-টু-ডেট লোক চাই, শুধু ড্রাফটস্‌ম্যান নয়। তোমার কাগজপত্রে লেখা আছে সেইন্ট অ্যাণ্ড মিলারে তুমি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের চাকরি করতে, ড্রাফটস্‌ম্যানের নয়। প্রশ্নের উত্তর দাও।

শ্যাম দ্রুত চিন্তা করে যায়। কিছুই মনে পড়ে না তার। মাথার ভিতরে ঘোলা জল টলমল করে ওঠে। তবু সে মাথা ঠাণ্ডা রেখে বে-পরোয়াভাবে বলে–তিনজন ডীন রাস্ক আছে। কোনজনের কথা জিজ্ঞেস করছো?

লোকটা সামান্য থমকে গিয়ে বলে–বাকী দুজন কে?

শ্যাম চোখ বুজে আন্দাজে বানিয়ে বলে–একজন নিউজিল্যাণ্ডের ভলিবল খেলোয়াড় অন্যজন অস্ট্রেলিয়ান কেমিস্ট।

লোকটি সামান্য দুলে ওঠে–অ্যাণ্ড দি থার্ড ওয়ান?

অসহায়ভাবে লোকটার দিকে চেয়ে থাকে শ্যাম, তারপর আস্তে আস্তে বলে–আমি জানি না। দি থার্ড ওয়ান মাস্ট বি আনইম্পর্ট্যান্ট।

–কিন্তু তুমিই বলেছো তিনজন আছে। সুতরাং আর একজন কে তা তোমার জানা উচিত।

–কিন্তু তুমি জানো না!

শ্যাম মাথা নাড়ে–না। তারপর আস্তে আস্তে বলে–ডীন রাস্ক নামে কেউ আছে কিনা আমি জানি না, যেমন ডীন রাস্কও জানেন না শ্যাম চক্রবর্তী বলে কেউ আছে কিনা! ইট ইজ মিউচুয়্যাল ইগনোর‍্যান্স স্যার!

তারপর আর কোনো শব্দ হয় না। অনেকক্ষণ চুপচাপ কেটে যায়। শ্যাম তিনজনকেই নীরবে লক্ষ্য করে। বাঁ দিকে কালো রোগা মাঝবয়সী মাদ্রাজী ভদ্রলোক বোধ হয় কম দামী অফিসার, সারাক্ষণ লোকটি তার ওপরওয়ালাদের সামনে মাথা নীচু করে আছে, একটিও কথা বলেনি। সামনে মুখোমুখি–বসা অল্পবয়সী বাঙালী লোকটি ছটফটে, অহঙ্কারী, খুব তাড়াতাড়ি ওপরে উঠে যেতে চায়। অনেকটা তার মতো। ডান দিকের আধবুড়ো লোকটিই সবচেয়ে শান্ত। মুখে হাসি, তবু পাথরের মতো অনড় মুখ, একটিও পেশী নড়ে না। বোঝা যায় না কোন্ দেশী লোক। আস্তে আস্তে শ্যামের হাই উঠতে থাকে, শরীর এলিয়ে আসে। শ্যাম জানে এরা কুকুরের মতো সতর্ক, খরগোশের মতো উৎকর্ণ লোক পছন্দ করে। তবু সে সাবধান হয় না। মাথা এলিয়ে দেয় চেয়ারের

পেছনে, হাই তোলে, চোখ রগড়ায়।

মুখোমুখি বসা লোকটা হঠাৎ মুখ তুলে বলে–আচ্ছা, আপনি আসতে পারেন।

শ্যাম ধীরে সুস্থে ওঠে, দরজার দিকে এগোয়। তারপর মাঝপথে সে দাঁড়িয়ে পড়ে –দরজাটা ডানদিকে সরে গেছে। একটু ইতস্ততঃ করে শ্যাম, তারপর ডানদিকে ঘুরে এগোয় চেষ্টা করে। তারপরই বুঝতে পারে বৃথা চেষ্টা, দরজাটা চক্রাকারে ধীরে ধীরে বাঁ দিকে সরে যাচ্ছে। বড় অদ্ভুত। সে আবার দাঁড়ায়। তার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। সে চোখ বুজে কয়েক পা হাঁটে। চোখ খুলে দেখে সেক্রেট্যারিয়েট টেবিলটার মুখোমুখি সে দাঁড়িয়ে আছে। ওপাশের তিনজন সকৌতুকে তাকে দেখছে। সামান্য লজ্জা বোধ করে শ্যাম। তিনজনের দিকে চেয়ে একটু হেসে অনাবশ্যক কথা বলে–আমার ড্রইং আপনারা দেখেছেন, আমার কাগজপত্র ও আমাকেও। এখন জিজ্ঞেস করি এ চাকরিটা কি আমার হতে পারে? বলতে বলতে সে এক-পা এক-পা করে পিছু হটে যায়। মাঝখানের আর বাঁ দিকের লোক দু'জন কথা বলে না, সম্ভবতঃ তার অবস্থা দেখে অস্বস্তি বোধ করে চোখ সরিয়ে নেয়। ডানদিকের আধবুড়ো লোকটা স্থির চোখে তার দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে, শান্ত গলায় বলে– সাইকোলিজিক্যালি ইউ আর আনফিট ফর দি জব।

পিছনে হাত বাড়িয়ে শ্যাম দরজার গোল হাতলটা হাতে পায়, তারপর 'ইয়াঃ' বলে হেসে উঠে। ইচ্ছে করে এগিয়ে গিয়ে সে লোকটার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলে–। আমি জানতুম তুমিই এদের মধ্যে সবচেয়ে পাকা। আমি হলে তোমকেই নিয়ে নিতুম আমার কোম্পানীতে।

ঝট করে দরজা খুলে বেরিয়ে আসে শ্যাম। রুমালে মুখ মোছে। খোলা বারান্দায় একটু দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর আস্তে দীর্ঘ সিঁড়ি বেয়ে নামতে থাকে শ্যাম। এবার তার দিক ঠিক থাকে, পা ফেলতে গোলমাল হয় না। বস্তুতঃ চাকরিটা হল না বলে সে খুব স্বস্তি বোধ করতে থাকে, তার চোখেমুখে হাওয়া লাগে।

বস্তুতঃ সে বুঝতে পারে, তার আর কিছুই করবার নেই।

।। ৪ ।।

তেইশে ডিসেম্বর শ্যাম তার একত্রিশের জন্মদিন পার হয়ে যাচ্ছিল। সকালবেলায় ঘুম ভাঙতেই তার খেয়াল হয়েছিল–আজ আমার জন্মদিন। তখনো বিছানা ছাড়েনি শ্যাম, চোখে আধো ঘুম, লেপের ওম-এর ভিতর থেকে সে অনেক বার গুণ গুণ করল–আহা! আজ আমার জন্মদিন! এতকাল সে জন্মদিনকে হিসেবের মধ্যে আনত না, তার ধারণা ছিল ওতে স্পীড কমে যায়। ধরো, তুমি সিঁড়ি ভেঙে উঠছো কিংবা নামছো, লিফটের দরজা খুলতে বা বন্ধ করতে বাড়িয়েছো হাত, জুতোর ফিতে খুলতে বা বাঁধতে যাচ্ছো, চুমু খেতে বাড়িয়েছো ঠোঁট, দাড়ি কাটতে গিয়ে হয়তো মাত্র জুলপির নীচে বসিয়েছো ক্ষুর–অমনি বয়স হয়ে যাওয়ার কথা মনে পড়লে আস্তে শিথিল হয়ে যায় হাত-পা, মন এলিয়ে পড়ে হাই উঠতে থাকে। অনাবশ্যকভাবে মনে হয়–কী হবে আর এইসব করে? কিছুই তো আর থাকে না শেষ পর্যন্ত! শ্যামের জন্মদিনে তাই কোনো বছরেই কোনো উৎসব নেই, তেইশে ডিসেম্বরের কথা তার খেয়ালই থাকে না।

রোজকার চেয়ে একটু দেরী করে বিছানা ছাড়ল শ্যাম। হাতমুখ ধুয়ে আয়নায় মুখ দেখে শ্যাম। আজকাল তাকে অনেকটা সাধু-সন্তের মতো দেখায়। চুল বেড়ে গিয়ে ঘাড়ের কাছে বাবরি পাক খেতে শুরু করেছে। আয়না হাতে শ্যাম এসে জানালায় দাঁড়াল। দক্ষিণের জানালায় রোদ পড়ে আছে। সামনেই একটা আমগাছ–কয়েকটা পাতার ছায়ায় একটা মাকড়সার জালে এখনো শিশিরের জল আটকে আছে। তার হাতের আয়না থেকে রোদ ঠিকরে জালটার ওপর পড়তেই শ্যাম আয়না ঘুরিয়ে নিল। তড়িৎগতিতে আলোটা গিয়ে পড়ল উল্টোদিকের বাড়ির তিনতলার একটা জানালায়। সামান্য কৌতূহল নিয়ে তাকিয়ে দেখল শ্যাম-একটা অয়েল পেইন্টিংয়ের ওপর পড়েছে আলোটা-বড়ো একটি মুখ, ঠোঁটে সকৌতুক হাসি। ভ্রূ কুঁচকে শ্যাম

আপনমনে বলল 'ব্ল্যাক-মার্কেটিয়ার। তারপর আলো ঘুরিয়ে নিল। লাল দরজাওলা একটা গ্যারেজের সামনে ডাস্টবিনের আশেপাশে ঘুরঘুর করছে তিনটে কুকুরছানা, তাদের ওপর আলো ফেলল শ্যাম। কিন্তু খোলা রাস্তায় যথেষ্ট রোদ রয়েছে, তাই আলোটা জমল না। সে একটু ঝুঁকে ছায়া খুঁজতে থাকে। ছেলেবেলায় আলো-ফেলার খেলা অনেক খেলেছে শ্যাম। এখন বয়স হয়ে গেছে। আজ একত্রিশ পেরিয়ে যাচ্ছে সে। ভেবে সামান্য হাসল শ্যাম। যেমন হাসি ছিল তার ক্লাশ সিক্সে বা সেভেনে। গলা বাড়িয়ে দেখল বাঁ দিকের মোড় পেরিয়ে সুখগতিতে আসছে রিকশা, তাতে গীটার হাতে একটি মেয়ে। সতর্ক হাতে আয়না সামলে নিল শ্যাম। কে জানে আলো ফেললে মেয়েটা রিকশা থামিয়ে দোতলায় উঠে আসবে কিনা, লাজুক হেসে বলবে কি না-ডাকছিলেন, তাই এলুম! শ্যাম জাফরানী শাড়ি পরা, ব্যাগ হাতে আর একটি মেয়েকেও ছেড়ে দিল-মেয়েটা অনেক দূর পর্যন্ত সোজা হেঁটে চলে গেল। শ্যাম আলোটাকে কয়েকবার দত্তবাড়ির দেয়ালে নাচিয়ে দিল, দেয়াল-ঘেরা লন-তাতে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে কাক, সিঁড়ির নীচের কুটো থেকে বেরিয়ে এসে একটা সাদা বেড়াল ডন দিচ্ছে। বেড়ালের মুখে শ্যাম আলো ফেলল, কোন ফল হল না, মুখ ঘুরিয়ে রাজরাণীর মতো অবহেলায় বেড়ালটা সিঁড়ি ভেঙে দরজা দিয়ে ঢুকে গেল। শ্যাম আলো ঘুরিয়ে দিতে একটা কাক উড়ে গেল। লনের ওপাশে দূরের একটা বাড়ির জানালায় অসাবধানে আলো পড়তেই চিকমিক করে উঠল কয়েকটা সাজিয়ে রাখা পেয়ালা পিরিচ। শ্যাম আলো ফেলতে ফেলতে ক্রমে আলোটার নাড়াচড়ার ওপর কর্তৃত্ব খুঁজে পাচ্ছিল। মিত্তিরদের বুড়ো বাপ বাজার করে ফিরছে, পিছনে চাকর-শ্যাম দুজনকেই ছেড়ে দেয়। খুব তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছে একটা ট্যাক্সি-জানালায় একটা অবাঙালী বাচ্চা ছেলে, শ্যাম ঝট করে তার মুখে ফেলে আলো, তারপর ট্যাক্সির গতির সঙ্গে তাল রেখে আলোটা স্থির রাখে একটুক্ষণ। বাচ্চাটা তার দিকে তাকায়, হাতে চোখ আড়াল করে, খানিকটা দূরে গিয়ে হঠাৎ জিভ ভেঙিয়ে চলে যায়। তারপর আলো ফেলতে তার ক্লান্তি লাগে। সে একটা গরু একটা বুড়ী আর একটা সিনেমার পোস্টারে নায়িকার মুখে পর পর আলো ফেলে। তারপর আয়নাটা রেখে দেওয়ার জন্য ঘরের ভিতরে চলে আসছিল শ্যাম। ঠিক এ সময়ে সে শুনতে পেল একটা মোটর সাইকেলের আওয়াজ, ডান দিকে মোড়ের ওপাশ থেকে আসছে। দ্রুত তার হাত-পায়ের পেশী শক্ত হয়ে ওঠে। অনেকদিন ধরে সেই কবে থেকে যেন মোটর সাইক্লিস্টদের ওপর একটা পোষা রাগ আছে তার। দ্রুত জানালার কাছে ঘুরে আসে সে। মোটর সাইকেলটা এক্ষুণি মোড়ে এসে বাঁক নেবে- মোড়টা তেমাথা। শ্যাম লক্ষ্য করে, বড় রাস্তার ওপর একটা গরু ধীরে রাস্তা পার হচ্ছে। মোড়ের থেকে মোটর সাইকেলের মুখ আর লোকটার কালো মাথা দেখা যেতেই শ্যামের আয়নার আলো ঠিকরে পড়ল মুখে-ঠিক মুখে। ঝড়ের মতো শব্দ তুলে বাঁক নিচ্ছিল মোটর সাইকেল, শ্যাম এক পলকের জন্য দেখল লোকটা তার আলো থেকে মাথা সরিয়ে নিতে গিয়ে কাত হল। তারপর আর কিছু দেখার ছিল না, শুধু গরুটার ভয়ঙ্কর লাফিয়ে ওঠা ছাড়া। তড়িৎগতিতে শ্যাম মেঝেতে বসে পড়ল, শুনতে পেল রাস্তার ওপর মোটর সাইকেলটার আছড়ে পড়ার ধাতব কঠিন শব্দ। সে হামাগুড়ি দিয়ে জানালার কাছ থেকে ঘরের মধ্যে চলে এল। আয়নাটা বিছানায় ছুঁড়ে দিয়ে দ্রুত দরজায় তালা লাগিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

রাস্তার ভিড়টাকে এগিয়ে গেল সে। লোকজন জড়ো হচ্ছিল দ্রুত। শ্যাম তাদের পাড়া ছাড়িয়ে গেল। খুব সুন্দর রোদ আজ, তেমন খুব শীতও। খুঁজে সে একটা নিরিবিলি চায়ের দোকান বের করল। খুবই ওঁছা দোকান। কোণের দিকে একটা জায়গা দখল করে বসে পড়ল কেন যে মোটরসাইক্লিস্টদের ওপর একটা পোষা রাগ আছে তার-তা ঠিক মনে পড়ছিল না শ্যামের। মনে করতে গিয়ে মাথার ভিতরে ঘোলা জল টলমল করে উঠল। মেঝের পড়াছিল খবরের কাগজ। সে নীচু হয়ে কুড়িয়ে নিল। অনেকদিন খবরের কাগজ পড়া হয় না। অন্যমনস্ক থাকার জন্যে সে খবরের কাগজে মাথা গুঁজে দিল। দিয়েই দেখল খেলার পাতা। একজন খেলোয়াড় কাল থেকে আটানব্বই রানে নট আউট আছে। বেচারা! সারারাত নিশ্চিন্ত ওর ঘুম

হয়নি! কম রানে আউট হয়ে গেলে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারত। তবু আরো দুই রান, মাত্র আর দুটো ভয়ঙ্কর বিভীষিকার মতো রান–বাইশ আর বাইশ চুয়াল্লিশ গজ মাত্র! শ্যামের ইচ্ছে হল লোকটার জন্য এক্ষুণি চুয়াল্লিশ গজ একটা ছুট দিয়ে আসে। এতটুকুর জন্য সারারাত না-ঘুমোনো, খাওয়ার অনিচ্ছা মহিলার প্রতি শীতল আচরণ–সবই সম্ভব। বেচারা লোকটা! ঐ দুটো রান না হলে...! না হলে কী যে হবে ভেবে শ্যাম খুবই অসহায়ভাবে চারদিকে একবার তাকিয়ে দেখল। মনে হল দৈব ছাড়া কোনো উপায় নেই। ঐ দুটো রান যে হবেই কোনো মানুষ তা নিশ্চিত করে বলতে পারে না। ভাবতে ভাবতে সামান্য অস্থির বোধ করে শ্যাম। সে খবরের কাগজটা ফেলে দিয়ে উঠে পড়ে। দাম দিয়ে দেয়। তারপর খোলা রাস্তায় রোদ আর বাতাসের মধ্যে এসে দাঁড়ায়। এলোমেলো হেঁটে যায় এ-রাস্তা থেকে ও-রাস্তা।

তারপর দুপুরবেলা সে তার পাইস হোটেলে নিজের সম্মানে নিজেকেই একটা ভোজ দিল। মাংসের হাড় ভাঙল মড় মড় করে, দই খেল চেটেপুটে। সুবোধ মিত্র সকাল ন'টায় খেয়ে আফিসে যায়। দেখা হল না। কিন্তু ভেবে রাখল শ্যাম, রাত্রে দেখা হলে মিত্রকে সে খাইয়ে দেবে। আজ মৌরি নিল না শ্যাম, বাইরে এসে দোকান থকে পান খেল একটা, আর কিনে নিল খুব দামী এক প্যাকেট সিগারেট। ভিখিরিদের দেওয়ার জন্য পুরো একটি আধুলি খুচরো করে নিয়ে পকেটে রাখল। বস্তুতঃ এখন মাসের শেষ, কিন্তু তার কোনো চিন্তাই নেই। ব্যাঙ্কে এখনো আড়াই হাজারের মতো মজুত আছে। ইচ্ছে করলে মাসের যে কোনো দিনকে মাস পয়লার বিকেলের মতো সুসময় করে তোলা যায়। একত্রিশের জন্মদিনে নিজেকে স্বাধীন বলে মনে হচ্ছিল তার। তার এমনও মনে হচ্ছিল যে, আজকের দিনটা বোধ হয় ভালই কেটে যাবে। পরমহূর্তেই মনে মনে নিজেকে শাসন করল সে। ভবিষ্যৎ-চিন্তাই ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সবচেয়ে বড় অন্তরায়। অতীত চিন্তাও। কাজেই সে সকালের কথা ভুলে গেল, বিকেলের কথাও আর ভাবল না। খর রোদ আর উত্তরে বাতাসের চমৎকার এই দুপুরের মধ্যেই মজে গেল তার মন। খ্রীস্ মাসের আর দেরী নেই। দোকানে লাল শালুতে লেখা 'হ্যাপি খ্রীসমাস। শো কেসে সাজানো কেক তুলা দিয়ে তৈরী তুষারক্ষেত্র আর বুড়ো সান্টা ক্লস। সামনেই একটা রুটির ভ্যান, পিছনের খোলা দরজা দিয়ে দেখা যায় মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত থোপে থোপে সাজানো রুটি। হঠাৎ মনে হয় পৃথিবীতে বড় সুসময় এসে গেছে। এবার বোধ হয় মাঠে মাঠে ফসল ফলেছে খুব, চাষাবাদের গৃহিণীরা হয়েছে সন্তানবতী। সরকারী বিজ্ঞপ্তি চলে গেছে গ্রামে গ্রামে–'আরো সন্তান উৎপাদন করো গো মা-জননীরা। জমিন পতিত রেখো না গো বাপ-সকল, সুসন্তানে ভরে দাও দেশ। আমাদের কারখানায় বাড়ছে উৎপাদন, আমাদের কৃষিতে বাড়ছে উৎপাদন, আমাদের খনিতে বাড়ছে উৎপাদন। এত ভোগ করার লোক কই গো? খাওয়ার লোক নেই বলে আমরা ইলিশের ঝাঁককে সমুদ্রে চলে যেতে দিলুম, বাছুরে খেতে শেষ করতে পারে না বলে আমাদের দুগ্ধবতী গরুগুলির বাঁট ফুলে দুধ খসে পড়ছে মাটিতে, ভরভরন্ত পাকা ফসলের ক্ষেতে আমরা ছেড়ে দিয়েছি মোষের পাল, আবাদের মৌচাক থেকে চুঁইয়ে পড়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে মধু। মা-জননীরা লোকজনে ভরে দাও দেশ। সুসন্তান দাও গো বাপ-সকল!' মুখে সামান্য হাসি, গায়ে শীতের স্বাস্থ্যকর রোদ আর ভরা পেটে শ্যাম আস্তে আস্তে হাঁটছিল। অতীতের কোনো মুখ মনে পড়ে না ভবিষ্যতের কোনো চিন্তা মনে আসে না। বড় তৃপ্ত এবং স্নিগ্ধ লাগছিল নিজেকে। ফুটপাথে ডাকবাক্সের পিছনে ছেঁড়া কাঁথার সংসার থেকে একটা ভিখিরির ছানা হামা দিলে ফুটপাথের মাঝামাঝি চলে এসেছে। শ্যাম একলাফে তাকে ডিঙিয়ে গেল। একজন হকার ধীর গম্ভীর স্বরে তাকে উদ্দেশ করে হাঁকল, 'গেঞ্জী...! ভীষণ চমকে উঠল শ্যাম। তারপর দ্রুত পেরিয়ে গেল গেঞ্জীওয়ালাকে। আর একটু হলেই অতীতের কথা মনে পড়ে যেত। সে সামনেই মোড়ের মাথায় বাঁক নিল। ফাঁকা রাস্তা। ঢিমে তালে ক্লান্ত একটি লোক ঠেলাগাড়ি ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। শ্যাম টক করে চোখ বুজে ফেলে। অমনি চোখের ওপর ছবি ফুটে ওঠে। সারি সারি সব দোকান, সৎ দোকানীরা পবিত্র চোখ নিয়ে বসে আছে। শালীন ও সুন্দরী যুবতীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে রাস্তায়, শান্ত ও সুন্দর শিশুরা হেঁটে যাচ্ছে,

নির্লোভ, বিনয়ী ও স্বাস্থ্যবান যুবা-পুরুষ দ্রুত চলেছে কাজে, কর্মঠ ও বিজ্ঞ বুড়োরা সকৌতুক চোখে বারান্দায় বা ব্যালকনিতে বসে কাটিয়ে দিচ্ছে সুন্দর অবসরের জীবন। সর্বত্রই অদৃশ্য বিজ্ঞাপন–বেঁচে থাকুন। আপনার জীবন আমাদের কাছে মূল্যবান।

হাইড্র্যান্টের জলে শ্যামের ডান পা ছপ্ করে গোড়ালি পর্যন্ত ডুবে গেল । চোখ চেয়ে হাসল শ্যাম। সামান্য ক্লান্তি লাগছিল তার। অনভ্যাসের বেশী খাবার তার পাকস্থলীতে ডেলা পাকিয়ে উঠছে। তবু ঘরে ফিরতে ইচ্ছে হল না তার। হাঁটতে হাঁটতে সে আবার বড় রাস্তায় চলে এল। চৌরঙ্গীর দিকে গেলে মন্দ হয় না, খ্রীসমাস ইভে ঐ দিকটাই জমজমাট। বাস-স্টপে ঘ্যান-ঘ্যান করে ঘুরে বেড়াচ্ছে কয়েকটা নানা বয়সের ভিখিরি, কালো চশমাপরা এক মহিলা রুমালে মুখ চেপে চোখ ফিরিয়ে বাসের পথ চেয়ে আছে, রেলিঙে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ' টেরিলিন–পরা দুই ছোকরা। বাস এসে গেল। সামান্য ভিড় ঠেলে নামা–ওঠার মধ্যে যে ধাক্কাধাক্কি তাতে গা ছেড়ে দিল শ্যাম। তারপর বাসের হাতল ধরার ঠিক আগের মুহূর্তে পকেটের যাবতীয় খুচরো পয়সা মুঠো করে তুলে ফেলে দিল রাস্তায়। রিনরিন ঠিনঠিন সেই শব্দ কয়েক মুহূর্তের জন্য রাস্তার অন্য শব্দকে ডুবিয়ে দিল। সেই শব্দের এত জোর যে চমকে উঠল আশপাশের লোকজন, নামতে বা উঠতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেল অনেকে। হাসি চেপে শ্যাম দেখল ফুটবোর্ডের ওপর একজন বুড়ো বাসের হাতল ছেড়ে দিয়ে টাল খেতে খেতে ভীষণ সন্দেহে নিজের তিনটে পকেট হাতড়ে দেখছে। পয়সা! আরে! পয়সা পড়ল কার! এরকম একটা চাপা উত্তেজনা তৈরী হয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছিল; ভিড়ের মধ্যে পানকৌড়ির মতো ডুব দিল দুটো লোক। শ্যাম নিশ্চিন্তে উঠে গেল বাসে। কন্ডাক্টর ঘন্টির দড়ি টেনে রেখে দিল, তারপর একটু ইতস্ততঃ করে দ্রুত বাজিয়ে দিল ঘন্টি, চেঁচিয়ে বলল, 'ঠিক আছে! ফুটবোর্ডে দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে দেখল শ্যাম, বাস-স্টপের ভিখিরিদের মধ্যে ছোটোখাটো একটা দাঙ্গা শুরু হয়ে গেছে। কিছু লোক জমে গেছে ইতিমধ্যেই। মুখ ফিরিয়ে শ্যাম বাসের ভিতরে ঢুকে যেতে লাগল। তারপর রড ধরে দাঁড়িয়ে চোখ বুজে ফেলল। সামান্য ভাত-ঘুম পেয়ে বসছিল তাকে।

এলগিন রোড পেরিয়ে সে বসবার জায়গা পেল। থিয়েটার রোডের কাছাকাছি কন্ডাক্টর ভাড়া চাইলে পকেটে হাত দিয়ে সামান্য থমকে গেল শ্যাম। একটিও খুচরো পয়সা নেই। বুক পকেটে দুটো দশ টাকার নোট। একটা বাড়িয়ে দিয়ে শ্যাম কন্ডাক্টরের দিকে তাকাল। ঝাঁকড়া চুলওলা কর্কশ চেহারার লোক, মুখে শিরা-উপশিরা জেগে আছে। মাথা ঝাঁকিয়ে লোকটা বলল–খুচরো দিন। বাসটা একটা স্টপে ধরল। শ্যাম লোকটার চোখে স্থির চোখ রেখে বলল–নেই। কন্ডাক্টর হাতের টিকিটে 'টিরিক' করে করে আঙুল দিয়ে শব্দ তুলল,পিছনে তাকিয়ে পার্টনারকে পুরুষ গলায় বলল–বলবে ভাই! তারপর দ্রুত হাতে ঘন্টির শব্দ তুলে শ্যামের দিকে চেয়ে বলল–খুচরো নেই? শ্যাম মাথা নাড়ে–নেই। আবার সেই হাতের টিকিটে 'টিরিক' শব্দ, বিরক্তিতে মাথা ঝাঁকায় লোকটি–নোটের ভাঙানি হবে না। শ্যাম নিথর–দৃষ্টিতে লোকটার দিকে চেয়ে থেকে বলে–তাহলে? লোকটা অবহেলায় মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাচ্ছিল্যের গলায় বলে–তাহলে আর কী! এমনিই চলুন। বলতে বলতে লোকটা ভিড়ের ভিতরে ঢুকে যায়, নেপথ্য থেকে তার গলা শোনা যায়–অনেকবার নোটিশ দেওয়া হয়েছে যে, বাসে বড় নোটের ভাঙানি পাওয়া যায় না। মুহূর্তেই চোখে-মুখে রক্ত ছুটে এল শ্যামের রাগে আর অপমানে শরীর কেঁপে উঠল তার। ইচ্ছে হল লাফিয়ে উঠে চিৎকার করে সবাইকে বলে–ভাইসব, একটু আগে গড়িয়াহাটার মোড়ে আমি মুঠো-ভরতি খুচরো পয়সা রাস্তায় ফেলে দিয়ে এসেছি....। কিন্তু বস্তুতঃ তা করল না শ্যাম। শান্তভাবে উঠে দাঁড়াল। কন্ডাক্টর পিছন ফিরে ওদিককার টিকিট নিচ্ছে, শ্যাম তার পিঠে খোঁচা দিয়ে বলল– আমি নেমে যাচ্ছি। লোকটা মুখ ফিরিয়ে তাকে দেখল, একটুও দুঃখিত না হয়ে বলল–আপনার ইচ্ছে। বাসসুদ্ধ লোক দেখছিল শ্যামকে। উকিলের মতো কালো পোশাকপরা বুড়ো একটা লোক শ্যামের রাস্তা আটকে বলল–দাঁড়ান, আমি দেখছি। আমার কাছে থাকতে পারে। বলেই লোকটা হাতের ফোলিও ব্যাগ এগিয়ে দেয় শ্যামের দিকে–এটা ধরুন। আমার

ভিতরের পকেটে আছে কিনা দেখি। শ্যাম বিনীতভাবে তার ব্যাগটা ধরল হাত বাড়িয়ে। লোকটা চলন্ত বাসে দোল খেতে খেতে তার গলাবন্দ কোটের তিনটে বোতাম খোলে, তারপর রহস্যময় অন্দরমহলে হাত চালিয়ে বের করে আনে একটা প্রকাণ্ড নোট-বই। লোকটা পাছে পড়ে যায় সেই ভয়ে শ্যাম লোকটার কাঁধ চেপে ধরে রাখে, পিছন থেকে একজন দয়ালু হিন্দুস্থানীও লোকটার পিঠে নিজের কাঁধ ঠেকা দেয়। লোকটা তার নোট-বই খুলতেই একগাদা খুচরো কাগজ ঝরে পড়ে। 'আহাঃ বলে বুড়ো তখন নীচু হয়ে কাগজ কুড়োয়, শ্যাম আর হিন্দুস্থানীটা তাকে ধরে রাখে। দাঁড়িয়ে এবার সতর্কভাবে অনেক কাগজপত্রের ভিতর থেকে টাকা বের করে লোকটা, গুণে-গেঁথে শ্যামের হাতে দেয়। প্রথমে ফোলিও ব্যাগটা, তারপর দশ টাকার নোট তার হাতে দেয় শ্যাম, তারপর একটু কৃতজ্ঞতার হাসি হাসে, পরোপকার করতে পারায় বুড়োর মুখেও সামান্য হাসি দেখা দেয়। শ্যাম ধীরেসুস্থে ভিড় ঠেলে এগোতে থাকে, পিছন ফিরে আর তাকায় না। কন্টাক্টরের কর্কশ গলা শোনা যায়, 'কি হল? ভাড়াটা?'-শ্যাম উত্তর দেয় না। ভাড়া দেওয়ার কোনো ইচ্ছেই সে বোধ করে না। তাই নিজেই ঘন্টির দড়ি টেনে বাস থামায় স্টপে, তারপর নামবার আগে নিজেই ছাড়বার ঘন্টি দিয়ে দেয়, ময়দানের কাছে নেমে পড়ে। চলন্ত বাস থেকে সামান্য গোলমাল তার কানে আসে, সে কান ফিরিয়ে নেয়। হাসিমুখে মাঠের টলটলে রোদের মধ্যে নেমে যায়।

একটা পাথর কুড়িয়ে অনির্দিষ্ট দিকে ছুঁড়ে মারে শ্যাম। ঘাসের ডাঁটি ছিঁড়ে নিয়ে চিবোয়, খুব ধীরে ধীরে হাঁটতে থাকে। সে কিছুতেই মনে করতে পারছিল না, কি কারণে, কেন মোটর-সাইক্লিস্টদের ওপর তার একটা পুরোনো, পোষা রাগ আছে। ভ্রূ সামান্য কুঁচকে ওঠে তার। পকেট হাতড়ে সে সিগারেটের প্যাকেট বের করে। পেটের ভিতরে গাঁজিয়ে উঠেছে দুপুরের খাবার, তার সামান্য বুকজ্বালা করে। দেশলাই জ্বালতে গিয়ে সে লক্ষ্য করল তার আঙুল অল্প অল্প কাঁপছে। গত কয়েক মাসে তার শরীর শুকিয়ে গেছে অনেক। এককালে প্রতি মাসের চার তারিখে ওজন নেওয়া তার বাতিক ছিল, তখন দিনের মধ্যে কয়েকবারই তার নিজেকে রোগা কিংবা মোটা বলে মনে হত। বহুকাল ওজন নেওয়া হয়নি আর। তবু সে জানে ওজন অনেক কমে গেছে। অনেক দুশ্চিন্তা ও খেদ ঝরে গেছে তার।

খুশী মনেই শ্যাম মাঠের মধ্যে অনেক দূর হেঁটে যায়। এলোমেলো হওয়ায় তার তেল -না-দেওয়া রুক্ষ চুল উড়ে আসে কপালের ওপর। আঙুল দিতেই চুলের জট টের পাওয়া যায়, চিরুনি বসালে চোখে জল আসে। শ্যাম সাদা পোশাক-পরা একদল ক্রিকেট খেলোয়াড়কে অন্যমনস্কভাবে পেরিয়ে গেল। পাতা-পোড়ানোর মিষ্টি গন্ধ পাওয়া যায় হঠাৎ। তারপর মাঠ-ভরা রোদ্দুরের ভিতরে সে ইচ্ছেমতো হাঁটতে থাকে, যেদিকে খুশী চলে যায়। বাঁ দিকে সাদা শূন্যতায় ধু-ধু করছে ভিক্টোরিয়া মোমোরিয়াল, ডান ধারে বহুদূরে দেখা যায় হাঁটু মুড়ে গঙ্গার কোল জুড়ে আছে হাওড়ার পোল, ধ্বংসাবশেষ দুর্গের শেষ জীর্ণ স্তম্ভটির মতো বিবর্ণ নিঃসঙ্গ অক্টরলোনী মনুমেন্ট। তারপর এক সময়ে তার আর দিক ঠিক থাকে না। সে স্তম্ভিতের মতো দাঁড়িয়ে দেখে হাওড়ার পোল তার বাঁ দিকে চলে গেছে, ডান দিকে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল। আবার কয়েক পা হেঁটে সে ডাইনে বাঁয়ে কোনটাকেই খুঁজে পায় না। কখনো সে সামনে পিছনে, কখনো বাঁয়ে ডাইনে, কখনো ডাইনে বাঁয়ে ওই দুটিকে দেখতে থাকে। মাঠের মধ্যে এত দূরে চলে এসেছে সে যে, দূরের রাস্তায় লোকজন প্রায় দেখাই যায় না। প্রকান্ড মাঠ ভূতগ্রস্তের মতো ঝিমঝিম করছে রোদে, ছেঁড়া কাগজ উড়িয়ে নিয়ে খেলছে বাতাস, আর পাতাপোড়ানোর মিষ্টি গন্ধ। তার শিরা-উপশিরায় রক্তের, গতি ক্রমে ঝিমিয়ে আসছে সে টের পায়। সে কোনোক্রমে একটা গাছের ছায়ার দিকে হেঁটে যেতে থাকে। গাছটা কেবলই সরে যায় ডাইনে বাঁয়ে দূরে সরে যায়। হাঁপিয়ে ওঠে শ্যাম। সামান্য অস্বস্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ সে ব্যাপারটা বুঝতে পারে না। তারপর আবার সে চেষ্টা করতে থাকে। গাছটার আশেপাশে ঘুরে বেড়ায়, চোখ বুজে এবং চোখ খুলে সে গাছটার ছায়ায় পৌঁছুতে চেষ্টা করে। অনেকক্ষণ লেগে যায়। এবং এক সময়ে সে গাছটার কাছে

পৌঁছে যায়। আপনমনে মৃদু কৃতিত্বের হাসি হাসে শ্যাম, তারপর চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়ে। প্রকাণ্ড খোলা উদোম আকাশ হঠাৎ নেমে আসে তার চেতনার ওপর। ক্রমে চোখ থেকে আলো মুছে যায়। অসহায় শ্যাম হাত বাড়িয়ে চেপে ধরতে চায় ঘাস-মাটি, গাছের ছায়া, কিন্তু টের পায়, তার জাগরণের তটভূমি অতিক্রম করে আসছে ঘুমের ঢেউ। তাকে নিয়ে যেতে থাকে। শেষবারের মতো একঝলক চেয়ে দেখে শ্যাম, হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মতো মনে হয় তার জাগরণ কিংবা ঘুম কোনোটাই তার ইচ্ছাধীন নয়। ভয়ংকর শক্তিমান কেউ তাকে তার ইচ্ছামতো চালিয়ে নিচ্ছে, কাঠি ছুঁইয়ে পাড়িয়ে দিচ্ছে ঘুম, কাঠি ছুঁইয়ে জাগাচ্ছে। এই রোদ, এই মাঠ, এই ঘাস কিংবা গাছের ছায়া, অথবা ওই ন্যাংটো উদোম আকাশের মধ্যেই কোথাও রয়েছে সে। শেষ চেষ্টায় সে খুঁজে দেখে প্রাণপণে, তারপর ধপ করে তার চেতনাহীন মাথা নরম ঘাস-মাটির মধ্যে ঘুমে ডুবে যায়।

মোটর-সাইকেলের ভীষণ শব্দে চমকে ঘুম ভেঙে গেল শ্যামের। শিউরে উঠে বসল সে। তড়িৎ গতিতে তাকিয়ে দেখল চারদিকে। তারপর ক্রমে ক্ষীণ হয়ে এল আওয়াজ। সে স্পষ্ট টের পেল শব্দটা আসছে তার মাথার ভিতর থেকে। সার্কাসে কিংবা শিয়ালদার রথের মেলায় জালে-ঘেরা গোল খাঁচার মধ্যে মৃত্যুকূপের সেই খেলায় যে-ভাবে মোটর-সাইকেল ঘুরতে ঘুরতে ওঠে কিংবা নামে, চক্কর দেয়, ঠিক অবিকল সেইরকমভাবে একটা মোটর সাইকেল এতক্ষণ তার মাথার ভিতরে ঘুরপাক খেল। সে জেগে উঠতেই সেই শব্দ ক্রমে ক্ষীণ হয়ে গভীর নিস্তব্ধতার ভিতরে মিলিয়ে গেল। তারপর নিজের হৃৎপিণ্ডের ধক ধক শব্দ শুনতে পেল সে। কিছুক্ষণ সে ভীষণ বোকার মতো, গাড়লের মতো তার চতুর্দিকে অন্ধকার মাঠ, আর কুয়াশায় ভরা শূন্যতার দিকে চেয়ে রইল। মনে হয় নিশিরাতের পরী তাকে উড়িয়ে এনেছে, শুইয়ে দিয়ে গেছে এই মাঠের মধ্যে। তারা নিয়ে গেছে তার স্মৃতি, স্বপ্ন আর ভবিষ্যৎ চিন্তা। এখন আর নিজের নাম মনে পড়ে না, পরিচয় মনে পড়ে না। হিম পড়ে ভিজে গেছে তার ধুতি আর চাদর, স্যাঁতস্যাঁত করছে স্যান্ডেল। উত্তরের বাতাস লাগে হঠাৎ, হি-হি ঠাণ্ডায় সে কেঁপে ওঠে। হঠাৎ খেয়াল হয়, ডান হাতের মুঠোয় ধরা দশ টাকার ভাঙানো নোট। মনে পড়ে যায়, বাস-ভাড়া দেওয়া হয়নি। মনে পড়ে যায়, আজ তার একত্রিশের জন্মদিন। মনে পড়ে যায় যে, সে শ্যাম।

উঠে পড়ে শ্যাম। ধীরেসুস্থে মাঠ পার হয়। ঘাসে হিম জমে আছে-শিশিরে ভিজে পায়ের পাতা থেকে কিলবিল করে শীত উঠে আসে শরীরে। বাস-রাস্তায় এসে সে বাস ধরল। সারা রাস্তায় সে কিছুতেই ভেবে পেল না, কেন সে ওই মাঠের মধ্যে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল! কেন সে বাসের ভাড়া দেয়নি! কেন সে খুচরো ছিটিয়ে দিয়েছিল রাস্তায়! কেন সে আয়নার আলো ফেলেছিল একজন মোটরসাইক্লিস্টের মুখে।

পাইস হোটেলের দরজায় সুবোধ মিত্রর সঙ্গে দেখা। মিত্র হই-হই করে ওঠে-সাড়েসাতটায় আপনি এখানে! আমিতো মাত্র বিকেলের থার্ড কাপ চা চালিয়ে গেলুম, দশটায় খেতে আসবো। চলুন মশাই-বলে মিত্র শ্যামের হাত ধরে-এক্ষুণি রাতের খাওয়া শেষ করলে মাঝরাতে খিদে পাবে। চলুন-

এতক্ষণের শীতভাব কেটে যায় শ্যামের। শরীরের উত্তাপ ফিরে আসে। মনে পড়ে, সারা দিন সে কথা বলেছে খুব কম। হিসেব করে দেখল, সকাল থেকে সে কথা বলেছে মাত্র চারটি লোকের সঙ্গে- প্রথম, চায়ের দোকানের বয়, তারপর হোটেলের ছোকরা চাকরকে মাংস আর দই দিতে বলেছিল, পানের দোকানদারের কাছে চেয়েছিল সিগারেট আর পান, কন্ডাক্টরকে বলেছিল খুচরো নেই, আর আমি নেমে যাচ্ছি।

সে হেসে মিত্রকে বলল-নিয়ে চললেন, কোথায়!

-কাছেই আমার আস্তানা মশাই। চলুন, দেখে আসবেন।

অনুগতের মতো শ্যাম মিত্রর সঙ্গে হাঁটতে থাকে, কেননা, এখন যে-কোনো সঙ্গই তার কাছে প্রিয় বলে মনে হয়। সে মিত্রর দিকে চেয়ে দেখে, এবং পাশ থেকে মিত্রর প্রোফাইল দেখে

তার এমন ধারণা হতে থাকে, যে, মিত্রর বয়স খুব বেশী নাও হতে পারে!

যেতে যেতে মিত্র লন্ড্রী থেকে কাপড় নিল, মুদির দোকান থেকে নিল বাতাসা, ফুলের দাকান থেকে গ্যাঁদফুল নিল কলাপাতায় মুড়ে। এ-সবের ফাঁকে ফাঁকে একটানা কথা বলে যাচ্ছিল মিত্র–আপনি মশাই ক্রিমিনাল!(শ্যামের শীত করে ওঠে।) আমি ভেবেছিলুম আপনি বেকার। আজ হোটেলের ম্যানেজারের কাছে শুনলুম, বেশ ভাল একটা চাকরি করতেন আপনি–অফিসার। ডিরেক্টারের বদমাইসী ধরে দিয়েছিলেন বলে আপনার চাকরি গেছে। হাঃ .....হাঃ... সত্যি নাকি! (শ্যাম মৃদু হাসে) তা আপনি মশাই, এখনো বেশ আদর্শ-ফাদশ্য মেনে চলেন দেখছি!....তা আমারও ছিল মশাই–ওই আদর্শ যাকে বলে। রাজযোগ আর লাইফ ডিভাইন–আমার নিত্যপাঠ্য ছিল, কণ্ঠস্থ ছিল গীতাখানা। কিন্তু মশাই.... (মিত্রর সঙ্গে শ্যামও দুঃখিতচিত্তে মাথা নাড়ে–হয় না!) খানিকটা উঠেও ছিলুম। শেষ দিকে ধ্যানে বসলে গা শিরশির করত, শরীর হালকা বোধ হত, আর জ্যোতি-ফ্যোতিও খানিকটা দেখতে পেতুম। বয়স!... না, তখন আর বয়স এমন কি কুড়ি-টুড়ি হবে। মেরুদন্ড শালগাছের মতো সোজা রেখে হাঁটতুম, বুকে আড়াআড়ি হাত রেখে দাঁড়াতুম বিবেকানন্দের মতো, আপনমনে বিড়বিড় করতুম–মাই ডিয়ার ব্রাদার্স অ্যাণ্ড সিস্টার্স.... হাঃ..হাঃ.....! সেই সময়ে আমার কুড়ি-একুশ বছর বয়সে, রাস্তা-ঘাটে, ঘরে-ছাদে, ক্যালেন্ডারের ছবিতে, সিনেমার পোস্টারে, স্মৃতিতে-স্বপ্নে এত মেয়েছেলে ছিল না মশাই! আর এখন দেখুন, হুড়মুড় করে কোথা থেকে এল এত মেয়েছেলে, ভরে গেল দেশ! বলতে বলতে কেমন ফ্যাকাশে দেখাল মিত্রকে, বিহ্বল চোখে সে একবার চারদিকে চেয়ে দেখল।

শ্যাম লক্ষ্য করে, মিত্রর বাঁ বগলে লন্ড্রীতে ধোয়ানো কাপড়, বাঁ হাতের বাতাসার ঠোঙা, ডান হাতে কলাপাতায় মোড়া ফুল। এখন যদি হঠাৎ মিত্রর ঘাড় কি নাক চুলকে ওঠে, তাহলে হয়তো মিত্র শ্যামকেই বলবে–দিন তো মশাই আমার ঘাড়টা(কি নাকটা) একটু চুলকে! ভাবতেই শ্যাম খুব বিনয়ের সঙ্গে হাত বাড়িয়ে বলল–আপনার ফুলটা আমর হাতে দিন।

মিত্র ঘাড় নাড়ে-না, না। এ আমার নিত্যকর্ম মশাই, মা কাঠের সিংহাসনে একটা ঠাকুর বসিয়েছিলেন, মরবার সময় মিনমিন করে বললেন–ঠাকুরকে একটু ফুল বাতাসা দিস। আমিও রোজ দিয়ে যাই। চার-ছ আনায় হয়ে যায় ব্যাপারটা। নইলে মশাই, ঠাকুর-দেবতায় আমার আর তেমন ভক্তি-শ্রদ্ধা নেই। ভগবান টগবান আছে বলে মনে হয় আপনার? বলে উৎসুক চোখে মিত্র শ্যামের দিকে তাকায়, তারপর নিজেই বলে–আছে বোধ হয় কিছু একটা, কিন্তু

বলতে বলতে গলির শেষে মিত্রর ঘরের সামনে পৌছে যায় তারা। মিত্র তালা খুলে ঘরে ঢুকে আলো জ্বালায়, বলে– এই আমার আস্তানা।

দেয়ালে অনেক ঠাকুর-দেবতার ছবি টাঙানো গোটা তিনেক ক্যালেন্ডার, ইজিচেয়ার, টেবিল আর এখানে-ওখানে স্তূপীকৃত বইপত্র। জ্যোতিষ-বিদ্যার দুটো পত্রিকা বিছানায় ওলটানো। টেবিলের রবিঠাকুরের ছবিতে একটা মালা পরানো, সামনে ধুপকাঠির স্ট্যান্ড। বিস্তর ধূলো জমেছে সর্বত্র। ঘরের জানালা মাত্র একটি, ভিতরের দিকে আর একটা দরজা। মিত্র বাঁ হাতে শার্টের বোতাম খুলতে খুলতে ডান হাতে দরজাটার ছিটকিনি নামিয়ে বলে–ভিতরটা দেখবেন নাকি!

শ্যাম বলে–থাক।

মিত্র শ্বাস ছাড়ে–কিচেন আছে একটা, ঘুপচি একটা স্টোররুম, ফ্যামিলির কোনো অসুবিধে নেই। কিন্তু সব লক্ষ্মীছাড়া।

মিত্র দ্রুত ধুতি শার্ট পাল্টে লুঙ্গি পরে নিল, এক লহমায় ভিতরে গিয়ে চোখ-মুখে, হাতে-পায়ে জল দিয়ে এল, তারপর টেবিলের সামনে একটা আসন পেতে মেঝেতে বসে শ্যামকে হাত দেখিয়ে একটু অপেক্ষা করতে ইঙ্গিত করল। শ্যাম লক্ষ্য করে, টেবিলের নীচে ঘুপচির ভিতরে একটা কাঠের ছোট্ট পালঙ্ক। সেখানে রয়েছে পিতলের গোপাল, মাটির কালী, রামকৃষ্ণ আর সারদামণির ছবি, একদিকে আলাদা একটি পিতলের সিংহাসনে চকচক করছে শিবলিঙ্গ। ছোট থালায় গ্লাসে জল আর বাতাসা সাজিয়ে দিল মিত্র, ফুল ভাগ করে দিল সব

দেবতাকে, তারপর চোখ বুজে কয়েক সেকেন্ড বসে রইল।

মিত্র উঠে দাঁড়াতেই শ্যাম বলে –কী মন্ত্র বললেন?

–বললুম, ঠাকুর, খাও। মা ঐ মন্ত্রই বলতেন। বলে মিত্র হাল্কা চালে হাসে–কিছু না মশাই, এ স্রেফ অভ্যাস। অনেকদিন ভুল করে একবার দেওয়া বাতাসা আবার দিয়েছি, জ্বরজারি হলে বিছানায় শুয়ে বলি, ঠাকুর, খাও। ঠাকুর তখন কি খায় কে জানে! তবে প্রসাদী বাতাসা আমি জমিয়ে রাখি কৌটোয়। বিকেলে মুড়ির সঙ্গে চলে যায়–হাঃ হাঃ..

মিত্র যত্নে রবিঠাকুরের ছবির সামনে ধুপকাঠি জ্বেলে দিল। শ্যাম লক্ষ্য করে, ছবির গলায় মালাটা তরতাজা। বোধ হয় সকালে কেনা। সে বলে–ও মালাটা কেন?

মিত্র লাজুক একটু হাসে–এটাও অভ্যাস বলতে পারেন। তবে-বলে একটু দ্বিধা করে মিত্র–আপনাকে বলছিলাম যে, ঠাকুরদেবতায় আমার আর ভক্তিশ্রদ্ধা নেই। কিন্তু কোথাও কিছু একটা আছে মশাই...রবিঠাকুর... রবিঠাকুর.. বলতে বলতে মিত্র আবর লাজুক একটু হাসে–সে একটা ব্যাপার আছে মশাই, আপনি ঠিক বুঝবেন না।

–কেন?

মিত্র চোখ সরিয়ে নিয়ে বলে–আসলে রবিঠাকুরকে আমি খুব ভক্তিশ্রদ্ধা করি।

–সে তো অনেকেই করে। শ্যাম হাসে।

–না, ঠিক সেরকম নয়। রবীন্দ্র-জয়ন্তীতে আমি যাই না কখনো, শান্তি-নিকেতন দেখিনি, জোড়াসাঁকোরও ঠিকানা জানি না। না মশাই, রবিঠাকুরের কবিতাও আমি খুব একটা পড়িনি, কেবল বাংলা সিলেকশনে যা ছিল তাই, আর দু একটা ছুটকোছাটকা। পুরো কবিতা একটাও মুখস্ত নেই, তবে দু-একটা লাইন যদি বলতে বলেন তো পারি, যেমন –রমনীর মন সহস্র বর্ষেরি সখা সাধনার ধন। কিংবা, ওগো বধু সুন্দরী... হাঃ হাঃ... না মশাই, ঠিক আপনারা যে চোখে দেখেন, সে চোখে নয়। রবিঠাকুর আমার কাছে অন্য রকম–একেবারে অন্যরকম। আলাদা।

মিত্র এসে শ্যামের পাশে চৌকিতে বসে, গলা সামান্য নামিয়ে বলে– বিপদে পড়লেই আমি রবিঠাকুরকে ডাকি, মশাই। মিত্রর মুখচোখ সামান্য গম্ভীর দেখায়। বলে, ছেলেবেলা থেকে মশাই, আমার এই অভ্যাস। ভাল মনে পড়ে না, সেই কবে ছেলেবেলায় একবার মাথায় টিকটিকি পড়েছিল বলে ভয়ে আমি দৌড় দিয়েছিলাম, দড়াম করে ধাক্কা খেয়েছিলাম বাবার পড়াশুনোর টেবিলে, কেঁদে উঠতে গিয়ে দেখি টেবিলের ওপর রবিঠাকুরের ঐ ছবি–মালা পরানো, সামনে ধুপকাঠি জ্বলছে, আমি কেঁদে বললুম–রবিঠাকুর , আমার মাথায় টিকটিকি...তুমি তাড়িয়ে দাও। আমার ঘন চুলের ভিতর থেকে তক্ষুনি টিকটিকির বাচ্চাটা ছিটকে পড়ল টেবিলে, তারপর দেয়াল বেয়ে উঠে গেল। আমি শিউরে উঠলুম। হাসবেন না মশাই, আমার মনে হয়েছিল, ছবির রবিঠাকুরের চোখেমুখে একটু হাসি ঝিকমিকিয়ে গেল। ভয়ে আমার গায়ে কাঁটা দিল, পালিয়ে গেলুম। তারপর ক্রমে বুঝতে পারলুম, আমি গোপনে একটা আলাদা রবিঠাকুরকে পেয়ে গেছি। সে আমার গোপন কথার মতো, মায়ের কাছে গায়ের জ্বর লুকিয়ে রাখার মতো করে আমি সকলের কাছ থেকে রবিঠাকুরকে আলাদা করে নিলুম, রাত্তিরে একা অন্ধকার ঘর পেরোতে পারছি না, ডাকলুম–রবিঠাকুর, আমি অন্ধকার পেরোতে পারছি না, পার করে দাও। সঙ্গে সঙ্গে মনে হত খুব আপনজনের মতো কেউ আমার হাত ধরল, আমি গটমট করে পেরিয়ে যেতুম ঘর। ঘুড়ি ধরা নিয়ে একবার খালাসীপাড়ার ছেলেদের সঙ্গে মারপিট লাগছে আমি মার খেয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিলুম–ঠাকুর, রবিঠাকুর, আমাকে এরা মারছে, তুমি আমাকে নিয়ে যাও। শুনে থমকে গিয়ে ছেলেগুলো হেসে গড়িয়ে পড়ল–রবিঠাকুর নিয়ে যাবে কি রে ছেলেটা। তাদের হাসির ফাঁকে গলে গিয়ে আমি টেনে দৌড় মেরেছিলুম। আমি কতবার আমাদের ফুলবাগানে ঘুরে বেড়িয়েছি রবিঠাকুরের সঙ্গে, চলে গেছি বহু দূরের নীলকুঠিতে ফল খেতে, রেল ব্রীজ হেঁটে পার হয়ে চলে গেছি শম্ভুগঞ্জের মেলায়, মাঝিদের ফাঁকি দিয়ে পাট-বোঝাই দুদারা নৌকোর গাঁটরির ফাঁকে বসে চলে গেছি অচেনা গঞ্জে। লোকে ভাবত, একা একা গেছে সুবোধ। কিন্তু তা নয়, আমার সঙ্গে

সব সময়েই থাকত রবিঠাকুর—ঐ অতো লম্বা, মাথায় কালো ঠোঙার মতো টুপি, গায়ে জোব্বা আর দুধ-সাদা দাড়িওলা রবিঠাকুর সবসময়ে থাকত আমার সঙ্গে, একটু কুঁজো হয়ে নরম একখানা প্রকাণ্ড হাতে ধরে থাকত আমার হাত। আমি নিশ্চিন্তে চলে যেতুম যেখানে সেখানে, পথ-হারানোর ভয় থাকত না, জানতুম রবিঠাকুর ঠিক পৌঁছে দেবে, ঝড়ে-জলে জোব্বার আড়ালে ঘিরে রাখবে আমাকে, ঘুমের আগে শুনিয়ে দেবে রূপকথার গল্প। মা, দিদি বা ঠাকুরমার কাছে কতবার শুনেছি, ভূতের ভয় পেলে বুকে রাম নাম লিখিস। সন্ধ্যেবেলা চার তারা না দেখে ঘরে ঢুকিস না। রাত্রে সাপের নাম করলে তিনবার আস্তিক মুনির নাম নিস। আমি সে-সব মানতুম না। আমি গোপনে রবিঠাকুরকে বলতুম—এরা তো জানে না যে, আমার তুমি আছো। তারপর খুব হাসতুম দু'জনে। আমাদের দু'জনের ছিল বাদবাকী সকলের সঙ্গে লুকোচুরি খেলা। না, সবসময়ে নয়, সবকিছু চাইলেই যে পাওয়া যেত তা নয়। এক বার একটা ছেলে আমাদের পোষা দাঁড়ের তোতা পাখীকে ঢিল মেরেছিল বলে আমি চেঁচিয়ে বলেছিলুম—রবিঠাকুর ওর চোখ দুটো কানা করে দাও। তার ফলে দু'দিন বাদে আমার চোখ উঠল। আর একবার আমি আমার ছোটো বোনের কাছে জোঁক করে বলেছিলুম যে, আমি রাত দশটার সময় একা একা ছাদে বেড়িয়ে আসতে পারি। সে বলল, ইল্লি! সঙ্গে সঙ্গে আমি বললুম-বাজি! সে তার জমানো পয়সা বাজি ধরলো একদিন রাত দশটায় আমি হাসতে হাসতে ছাদে চলে গেলুম। কিন্তু নামবার সময় আমাদের পোষা বেড়ালের গায়ে পা পড়তে বেড়ালটা আমাকে আঁচড়ে কামড়ে দিল সে রাতে রবিঠাকুর আর কথা বলেনি আমার সঙ্গে; কেননা—কেন আমি জেনেশুনে বাজি ধরেছিলুম! কেন আমি ঠকিয়ে নিতে চেয়েছিলুম আমার ছোটো বোনটার টিফিন-না-খাওয়া, পুঁতির-মালা-না-কেনা কষ্টে জমানো পয়সা! হ্যাঁ মশাই, যতক্ষণ আমি পবিত্র ও শুদ্ধ থাকতুম, ততক্ষণই রবিঠাকুর থাকত আমার সঙ্গে। ঝড়ে-জলে, আলোয়-অন্ধকারে, ঘরে কিংবা দূরে—সবসময়ে ঐ অতো লম্বা, মাথায় কালো টুপি, জোব্বা পরা দাড়িওলা লোকটা সব কাজ পেলে আমার সঙ্গে থাকত।

ক্রমে মিত্রর চোখে চিকচিক করে ওঠে জল—না মশাই, আপনাদের রক্তমাংসের রবিঠাকুরকে আমি চোখে দেখিনি। আপনার কি মনে হয় আমার রবিঠাকুরের সঙ্গে আপনাদের রবিঠাকুরের কোনো মিল আছে?

শ্যাম মাথা নাড়ে—না।

—আঃ! ঠিক তাই। আসলে আমিই ঠিক আসল রবিঠাকুরকে পেয়েছিলুম মশাই। কিন্তু রাখতে পারলুম না। ক্রমে বয়স বাড়তে লাগল, গালে এল ব্রণ ঘুমে এল অবৈধ স্বপ্ন, চলায় ফেরায় এল সতর্কতা। আমার ভিতরে মশাই পাপ ঢুকে যেতে লাগল। তখন রবিঠাকুরের কবিতা পড়ি স্কুলে, মানে বই থেকে অর্থ দেখে নিই। কিন্তু কেবলই মনে হয় আমি যাকে চিনতুম এ সে নয় একদিন আমি আমাদের বাগানের কোণে শিমুলগাছতলায় বসে ঘাসের ডাঁটি দাঁতে কামড়ে আস্তে ডাকলুম—রবিঠাকুর! কোনো সাড়া এল না। আবর ডাকলাম। সাড়া এল না। এল না তো এলই না। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে ডাকলুম, সকালে নদীর জলের দিকে চেয়ে ডাকলুম.....তারপর বসলুম আমার গোপন কান্না কাঁদতে। গেল আমার রবিঠাকুর, গেল আমার সাহস, শুদ্ধতা, গেল আমার শৈশব; বুকের শব্দে বিসর্জনের বাজনা শুনলুম।

মিত্রর চোখ বেয়ে, নেমে এল জল—ঘুমের মধ্যে কোল থেকে যেভাবে সরে যায় বাচ্চা ছেলে! তারপর থেকেই আমার জীবন একটা ট্র্যাজেডী মশাই....

বলতে বলতে আস্তে ফুঁপিয়ে ওঠে মিত্র, হাঁটু মুড়ে মুখ গুঁজে দেয়, কাঁদতে থাকে। একটা ঘোরের মধ্যে শ্যাম এগিয়ে গিয়ে মিত্রর কাছ ঘেঁষে বসে, মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়, এলোমেলোভাবে বলতে চেষ্টা করে—আমি বুঝতে পেরেছি, আমি বুঝতে পেরেছি .....

শ্যাম মিত্রর অস্ফুট কথা শুনতে পাচ্ছিল—রবিঠাকুর ছাড়া আমার কিছু নেই—নেই। এখন আমাকে কে আবার দেবে সেই রবিঠাকুর? কে দেবে?

গভীর দুঃখে শ্যাম মাথা নাড়ে—ঠিক।

মুখ না তুলেই মিত্র বলে–সবচেয়ে বড় কথা কী জানেন!

–কী?

–আমার আর ভালবাসা নেই।

–ভালবাসা নেই? শ্যাম অবুঝের মতো প্রশ্ন করে।

–নেই। আমি আর কোনোদিনই কোনো কিছুতেই তেমন করে ভালবাসতে পারলুম না। বলেই মিত্র গভীরতর কান্নায় ডুবে যেতে লাগল।

মিত্রকে কাঁদতে দিয়ে শ্যাম ধীর, নিঃশব্দ পায়ে উঠে এল। বেরিয়ে এল রাস্তায়। অন্যমনস্কভাবে সিগারেটের প্যাকেট হাতড়ে বের করল পকেট থেকে। দেশলাই জ্বালাতে গিয়ে খস্ শব্দে হঠাৎ মনে পড়ে যে, আজ একত্রিশ জন্মদিন পার হয়ে গেল। মিত্রকে খাওয়ানোর কথা ছিল আজ। হল না। সামান্য একটু হেসে শ্যাম হাঁটতে থাকে।

গলির মুখে নির্জন রাস্তায় হঠাৎ একটা খুব লম্বা লোক শ্যামের উল্টো দিক থেকে হেঁটে আসে। চমকে যায় শ্যাম–মিনু না! না, মিনু না, অন্য লোক, অনেকটা মিনুর মতো দেখতে।

দোতলার সিঁড়িতে সাদা একটা বেড়াল বলের মতো গোল হয়ে শুয়েছিল। শ্যাম অন্য মনে লাথি ছুঁড়ল, "ফ্যাঁস করে লাফিয়ে ওঠে বেড়ালটা, নিঃশব্দে বিদ্যুৎগতিতে দৌড়ে উঠে যায় সিঁড়ির মাথায়, সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে শ্যামের দিকে তাকিয়ে থাকে। শ্যাম দাঁড়িয়ে থাকে, বেড়ালটার দিকে চেয়ে দেখে–ভয়ঙ্কর ঘেন্নায় রাগে বেড়ালটার দু'চোখ জ্বলছে। শ্যাম টের পায়, তার সামনের বাতাস বিদ্বেষে বিষিয়ে আছে। সিঁড়ি ভাঙতে পা তোলে শ্যাম, কিন্তু এগোতে পারে না। বেড়ালটা স্থির চোখে তাকে দেখে। হঠাৎ সে শুনতে পায়, তাকে ফেলে রেখে তারই পায়ের শব্দ সামনের সিঁড়ি ভেঙে উঠে যাচ্ছে। আর্তনাদ করে উঠতে গিয়ে আস্তে হেসে ফেলে শ্যাম। না, সব ঠিক আছে। সে নিজই উঠছে সিঁড়ি ভেঙে! শুধু কয়েক মুহূর্তের জন্য সে নিজের দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল।

অনেক রাতেও শ্যাম তার ঘরের জানালার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। বাইরে ঘন কুয়াশা, গাছপালা স্থির। একটা ল্যাম্পপোস্টের একটু পাথুরে আলোর ভিতর দিয়ে ল্যাঙ করে একটা ঘেয়ো কুকুর চলে যায়। দূরে পুলিশের বুটের শব্দ ঘুরে বেড়াচ্ছে শূন্য রাস্তায়।

শ্যাম তার সকালে কেনা প্যাকেটের শেষ সিগারেট ঠোঁটে চেপে ধরে।

দেশলাই জ্বালাবার খস্ শব্দে ভীষণ চমকে ওঠে সে। তার মাথার ভিতরে টলমল করে ওঠে ঘোলা জল। শূন্য চোখে কুয়াশার দিকে চেয়ে হঠাৎ তার মনে পড়ে যায়–মাই গু-উ-ডনেস! টু-ডে কিল্‌ড এ ম্যান!

।। ৬ ।।

লোকটা যে মরেছেই, এমন কথা নিশ্চিত করে বলা যায় না। অনেকেই দেখেছে ব্যাপারটা, পাড়ায় একটু খোঁজ-খবর করলেই সঠিক খবরটা জানা যেতে পারে। তবু সামান্য দ্বিধায় পড়ল শ্যাম, কেননা, সে যে জানালায় দাঁড়িয়ে আয়নার আলো ফেলছিল এটাও অনেকের পক্ষে দেখে থাকা সম্ভব।

সকালে উঠে তাই শ্যাম প্রথমে খবরের কাগজটা দেখল। না, তাতে কোনো মোটর-সাইক্লিস্টের মৃত্যুর খবর নেই। একজন সাইক্লিস্টের সঙ্গে একটি টেম্পো ভ্যানের ধাক্কা লেগেছিল চিৎপুরে, একটি বাচ্চা ছেলে মারা গেছে ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে রাস্তা পার হতে গিয়ে লরির চাপায়, একজন অজ্ঞাতনামা (৪০) লোক বাস থেকে পড়ে গিয়ে পার্ক স্ট্রিটের মোড়ে, আর একজন...না, কোনো মোটর সাইক্লিস্ট নয়। কাল কলকাতায় কোনো মোটর-সাইক্লিস্টেরই হয়নি।

বড় হতাশ হল শ্যাম। এখন এই লোকটা, এই লোকটা, এই মোটর-সাইক্লিস্ট লোকটা যদি মরে না গিয়ে থাকে, তবে হয়তো তার হাত-পা একটু কেটেকুটে গেছে, কিংবা ভেঙেছে কয়েকটা হাড়গোড়। সে ক্ষেত্রে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আসবার পর লোকটা অনায়াসে তার জানালাটা খুঁজে বার করতে পারে, এবং তারপর তাকেও। তখন একদিন না একদিন অকারণে আয়নার

আলো ফেলার জন্য তাকে একটা অচেনা লোকের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে। শ্যাম জানে লোকটা আইনগভাবে কিছুই করতে পারে না। তবে লোকটা খুব লম্বা চওড়া এবং নিষ্ঠুর হতে পারে। না, তাকে ভাল করে দেখেনি শ্যাম, শুধু আয়নার আলো তার মুখে ফেলে জানালার নীচে বসে পড়েছিল। কেন আলো ফেলেছিল তা শ্যামের জানা নেই, তবু শ্যাম মাত্র এইটুকুই বলতে পারে।

–না মশাই, আপনার ওপর আমার কোনো রাগ ছিল না। আপনাকে আমি চিনতুমই না। অনেকদিন ধরে আমার হাতে কোনো কাজ নেই, জমানো টাকা ফুরিয়ে আসছে, আর ক্রমে ক্রমে আমি কেমন ঠাণ্ডা মেরে আসছি। কাজেই শরীর-মন গরম রাখার জন্য ঝিমিয়ে পড়ার হাত থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য সারাদিন আমাকে নানা খেলা তৈরি করে নিতে হয়। এই সবকিছুই মশাই একটি কার্যকারণসূত্র বাঁধা। যদি একটা মা-বাপ তোলা গালাগাল আমি সহ্য করতে পারতুম তাহলে আমি আজও থাকতুম সেই শ্যাম–যে টেলিফোন তুলে নেওয়া থেকে সিঁড়ি বেয়ে ওঠা-নামা, এই সব কাজই খুব সুন্দর এবং ভদ্রভাবে করত, যে সারাদিন কেবল নিজের কথাই ভেবে যেতো এবং তাহলে এই আলো ফেলার খেলা তাকে খেলতে হত না এবং আপনিও নিরাপদে তেমাথায় মোড় ঘুরতে পারতেন–

শ্যামের এইসব যুক্তি যে লোকটা শ্যামের মতো করেই বুঝবে তার কোনো মানে নেই। সে ক্ষেত্রে লোকটা শ্যামের দিকে দু'-এ পা এগিয়ে আসতে পারে। তখন কী করা উচিত তাও শ্যাম ভেবে দেখল। সে ক্ষেত্রে হাতের কাছে কিছু অস্ত্রশস্ত্র থাকা দরকার, দেয়ালে থাকা দরকার একটা পালিয়ে যাওয়ার গুপ্ত দরজা, আর জানালা দিয়ে নেমে যাওয়ার জন্য একটা দড়ির সিঁড়ি। কিংবা, ইতুর সঙ্গে যে ছোঁয়াছুঁয়ির খেলাটা খেলেছিল শ্যাম, সেই খেলাটাও তখন খেলা যেতে পারে। কিংবা সুবোধ মিত্রকে গিয়ে বলা যেতে পারে, 'এক জায়গায় বেশি দিন থাকা ঠিক নয় মশাই, আসুন আমরা ঘর বদল করে ফেলি।'

শ্যাম সামান্য উত্তেজনা বোধ করতে থাকে। সে দ্রুত তার ঘরের চারদিক ঘুরে ঘুরে দেখে নেয়। একটা মাত্র দরজা, তারপর অপরিসর প্যাসেজ, সিঁড়ি। জানালার কাছে এসে দেখে, প্রায় বারো চৌদ্দ ফুট নীচে শান বাঁধানো ফুটপাত। ফিরে আবার ঘরের দিকে চেয়ে দেখে শ্যাম। চিন্তায় তার ভ্রূ কুঁচকে ওঠে। ডান দিকের দেয়ালে বাথরুমের পলকা দরজা। নিজেকে খুব নিরাপদ মনে হয় না শ্যামের। কোনোখানেই সেই লুকিয়ে থাকবার নিরাপদ জায়গা, বা পালিয়ে যাওয়ার সহজ পথ। লোকটা যদি খুব গায়ের জোরওয়ালা লোক হয়, যদি খুব লম্বা চওড়া, নিষ্ঠুর হয়, তাহলে আত্মরক্ষার জন্য শ্যামকে একটু প্রস্তুত থাকতে হবে। ভাবতে ভাবতে উত্তেজনায় শ্যাম ঘরের ভিতরে অদৃশ্য এবং অনুস্থিত প্রতিপক্ষে তাড়া খেয়ে এদিক-ওদিক দ্রুত সরে গেল। লাফ মেরে উঠল চৌকিতে, কয়েক পাক ঘুরল, বাতাসে ঘুঁষি ছুঁড়তে ছুঁড়তে এগিয়ে গেল, ঘুঁষি মারল দেয়ালে–যেমন ঘুঁষি খেয়ে একবার রূপশ্রী ফার্নিশার্সের ওয়ার্ডরোবের পাল্লাটা চোট খেয়েছিল, আর দেয়ালের একটা দুর্বল অংশের চুণবালি পড়েছিল খসে।

তারপর হাঁফাতে হাঁফাতে শ্যাম আপনমনে বলল–না মশাই,আপনার ওপর আমার কোনো রাগ নেই। ছিলও না। বলতে বলতে বাতাসে হাত এগিয়ে দিল শ্যাম খুব বিনীতভাবে, অদৃশ্য এবং অনুপস্থিত লোকটার হাত ধরে ঝাঁকিয়ে দিল, তারপর বলল–চা খাবেন?...হ্যাঁ হ্যাঁ বসুন, বিছানাতেই বসুন, কিংবা–বলতে বলতে শ্যাম ঘরের একমাত্র চেয়ারটাকে জানালার কাছে টেনে আনল–কিংবা এই চেয়ারটায় বসুন, রোদে পিঠ দিয়ে। চমৎকার আরাম লাগবে, তারপর, আমি আপনাকে দেবো গরম–গরম এক কাপ চা-

বলতে বলতে শ্যাম সারা ঘরে পায়চারি করে বেড়ায়–না, আপনাকে খুব একটা খারাপ দেখাচ্ছেনা। যদিও আপনার মুখটা একটু কেটেকুটে গেছে, একটা হাতে একনো ব্যান্ডেজ, তবুও আপনাকে বেশ বীরের মতোই দেখাচ্ছে–অনেকটা যুদ্ধফেরত সোলজারের মতোই আপনি কি বিবাহিত? না? তাহলে আরো ভাল, এই অবস্থাতে আপনি মেয়েদের সবচেয়ে বেশী আকর্ষণ করতে পারবেন। আমাদের দেশের মেয়েরা বীরপুরুষ ছেলেদের দেখাই পায় না, যে পুরুষ তারা দেখে

সে–ছোকরারা মিনমিন করে ঘুরে বেড়াচ্ছে মেয়েদের স্কুল–কলেজের আশেপাশে, যাতায়াতের রাস্তায়, পিছু নিচ্ছে কিছুদূর পর্যন্ত, ভুল বানানে লিখছে প্রেমপত্র, পরিচয় হলে নিয়ে যাচ্ছে বড়জোর লেক বা ময়দানে, ভিক্টোরিয়ায় বা পার্কে, তারপর সেখানে বসে ...থাকগে! আসল কথা, আহম্মক পুরুষ মেয়েরা পছন্দ করে। তাছাড়া, আপনাকে ষাঁড়ে গুঁতিয়ে দেয়নি, আপনি টেম্পো বা ঠেলাগাড়ির ধাক্কা খাননি, রাস্তার হামেশা হাঙ্গামায় বেমক্কা ইঁটের টুকরো এসে পড়েনি আপনার গায়ে। আপনি খানাখন্দেও পড়ে যাননি। আপনি আহত হয়েছেন, মোটর-সাইকেল দুর্ঘটনায়। ব্যাপারটার মধ্যে একটু বীরত্বের গন্ধ আছে না? বলতেই চোখে ছবি ভেসে ওঠে–একটু অহঙ্কারী, সাংসী ছুটন্ত এক পুরুষ দুটো ছড়ানো হাতে বুনো ঘোড়ার ঝুঁটির মতো ধরে–থাকা মোটর -সাইকেলের কাঁপা হাতল, বুক চিতিয়ে, পা বাঁকিয়ে বসে থাকার সেই উগ্র ভঙ্গী,হাওয়ায় উড়ছে চুল, শার্টের কলার এলোমেলো, দাঁতে টিপে রাখা একরোখা একটু হাসি... চমৎকার নয়! ছেলেবেলা থেকেই মোটর-সাইক্লিস্টদের আমি ঐ চোখে দেখে আসছি। বলতে কি, আমার জীবনের একসময়ে একমাত্র লক্ষ্য ছিল বেপরোয়া একজন মোটর সাইক্লিস্ট হয়ে যাওয়া-আর কিছু নয়–কেবল খুব ছুটন্ত একটা মোটর-সাইকেলে ঐ ভাবে বসে থাকা। সেই কারণেই আমার সতেরো–আঠারো বছর বয়সে প্রথম কলকাতায় এসে আমি সার্জেন্ট দেখে মুগ্ধ হয়েছিলুম। কোমরে ধূসর রঙের পিস্তল, মাথায় কালো টুপি আর ঐ লাল মোটর-সাইকেল! সার্জেন্ট দেখলে আমি রাস্তার সুন্দরী মেয়েদের লক্ষ্যই করতুম না.....

চেয়ারে অদৃশ্য লোকটা নড়ে ওঠে যেন।

শ্যাম সেঙ্গ সঙ্গে দু'হাত তুলে বলে–না মশাই, আমি আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য কিছু বলছি না, একথা সত্যিই যে খেলার জন্যও আপনার মুখে আয়নার আলো ফেলা ঠিক হয়নি ..কিন্তু দেখুন, আমারও কিছু করার নেই। বড় অসময় চলছে ...সকাল থেকেই দিন লম্বা হতে শুরু করে, সন্ধ্যে থেকেই রাত অফুরান মনে হয়। কিছু ঘটে না, বস্তুতঃ কিছুই ঘটে না। দিনে দু'বার চিঠির বাক্স খুলি; আমি ... পাখির বাসার মতো ছোট্ট চিঠির বাক্স খুলতে গিয়ে প্রতি বার মনে হয়-দরজা খুললেই লাফিয়ে পড়বে একটা খরগোসের বাচ্চা, কিংবা হাত দিলেই পাওয়া যাবে গোলাপী কাগজে মোড়া কোনো উপহার, কিংবা অচেনা মেয়ের লেখা ভালবাসার চিঠি। কিছুই ঘটে না, বস্তুতঃ কিছু ঘটে না।..... সকালে উঠে মনে হয় আজ কেউ আসবে–খুব অচেনা রহস্যময় কেউ–যাকে দেখে মনে হবে চেনা, অথচ চেনা যাবে না, এবং যে যাওয়ার সময় কিছু রহস্য রেখে যাবে; ঘুমোবার সময়ে মনে হয় আজ স্বপ্নের ভিতরে আমি পেয়ে যাবো কোনো দৈব শিকড়বাকড়, ক্যানসারের ওষুধ কিংবা গুপ্তধনের সন্ধান; কুয়াশার রাস্তায় হাঁটবার সময়ে, মনে হয়, কুয়াশা কেটে গেলেই দেখতে পাবো আমি হঠাৎ অচেনা বিদেশে পৌঁছে গেছি, যেখানে খাওয়ার লোক নেই বলে ইলিশের ঝাঁক চলে যাচ্ছে সমুদ্রে, গরুর বাঁট থেকে খসে পড়ছে দুধ, চাক থেকে মধু চুঁইয়ে মাঠ যাচ্ছে ভিজে, যেখানে সৎ ব্যবসায়ীরা দোকান সাজিয়ে বসে আছে–যেখানে সারা দেশে একদাম, যেখানে শান্ত ধার্মিক মানুষেরা ধীরে পায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সারা বছর যেখানে চলেছে উৎসব ...

শ্যাম চেয়ারটার সামনে এসে দাঁড়ায়, মাথা নাড়ে–কিছুই ঘটে না! বস্তুতঃ কিছুই ঘটে না!

তারপর শ্যাম বিনীতভাবে অদৃশ্য অনুপস্থিত লোকটাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দেয়–আচ্ছা, আবার দেখা হবে.....

ঘরের মাঝখানে আবার ফিরে আসে শ্যাম, বিষণ্নভাবে চুপ করে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর হঠাৎ 'ইয়াঃ' বলে চমকে হেসে ওঠে। সিগারেট ধরিয়ে আবার খবরের কাগজটা তুলে নেয়, গুন গুন করে বলে–মাই গু–উ–ড–নেস, আই কুডনট কিল দ্যা ম্যান।

ঘরের চারিদিকে অন্য মনে চেয়ে দেখে শ্যাম–নাঃ, বস্তুতঃ কোথাও নেই লুকিয়ে থাকবার জায়গা কিংবা পালিয়ে যাওয়ার সহজ পথ।

দুপুরে বেরোনোর সময় শ্যাম তিনটে চিঠি পেল।

জীবনবীমার প্রিমিয়ামের চিঠি, খামের উপর দু'হাতে আড়াল করা প্রদীপের ছবি আপনার জীবন মূল্যবান। ইলেকট্রিকের বিল, আর পাকিস্তানের কালচে খামে বাবার চিঠি। কোনোটাই ভাল করে পড়ে দেখে না শ্যাম। বাবার চিঠির দিকে চেয়ে থাকে, মাঝে মাঝে হঠাৎ এক-আধটা লাইন চোখে পড়ে– সঞ্চয়ী না হইলে ভবিষ্যতে নিরুপায় হইবা... এতদূর হইতে আমরা তোমার জন্য আর কী করিতে পারি, ভরসা একমাত্র দয়াল ঠাকুর.... চাকুরীর বন্দোবস্ত হইল কিনা সত্বর জানাইবা...সোনাকাকা ও রাঙাপিসির খোঁজখবর লইও, অভাবের সময়ে আত্মীয়স্বজন.. আশু গাঙ্গুলীর সহিত দেখা করিও। সে আমার বাল্যবন্ধু, হাওড়ায় তিনটা লোহার কারখানা, ডোভার লেনে চারিতলা বাড়ি, গাড়ি...জমিজমা আর কিনিতে ভরসা হয় না, অসময় পড়িয়াছে....সময় থাকিতে হিন্দুস্থানে না যাওয়া অবিবেচকের কাজ হইয়াছে.....এখানে গঙ্গা নাই, বড় দুঃখ.....ধনভাইয়ের শ্রাদ্ধ হইয়া গেল, সমারোহ হয় নাই, হিন্দুস্থান হইতে তাঁহার ছেলেরা আসিতে পারে নাই, জ্ঞাতিরা মুখাগ্নি করিয়াছে....বড় ভয় হয়...তোমার মায়ের অবস্থা পূর্বতবৎ শয্যাশায়ী, পুলিনের বউ আসিয়া রান্নাবান্নার কাজ করিয়া দিয়া যায়.....তোমার মা ঘুমের মধ্যেও মাঝে মাঝে তোমার নাম ধরিয়া ডাকেন.....এখানে জিনিসপত্রের দাম....চালের দাম যাহা শুনি, তাহাতে আশ্চর্য হইতে হয়....বাঙালীর ছেলে, দুইবেলা ভাত না খাইলে শরীর থাকে না....সাবধানে থাকিও.....এখন ঠাকুর ভরসা ....তোমাকে সংসারী দেখিয়া যাইতে পারিলে নিশ্চিন্তে চোখ বুজিতাম।

দশ বছর আগে বাবা শেষবার এসেছিল কলকাতায়, শেয়ালদায় আনতে গিয়েছিল শ্যাম। দেখল, যেন একটা অচেনা লোক, একটু কুঁজো, কালো রোগা চেহারা। প্রণাম করতেই পিঠে হাত রেখেছিল বাবা, কথা বলতে গিয়ে গলা কেঁপেছিল–মনু, কেমন আছ? যে কয়দিন ছিল, বাবা একটুও স্থির থাকেনি। কাঁচড়াপাড়া, হালিশহর, বৈঁচীগ্রাম, সোদপুর কিংবা ডায়মন্ড হারবার ঘুরে বেড়িয়েছিল আত্মীয়দের বাড়ি বাড়ি। তাকে ডেকে বলত– মনু, চিন্যা রাখ। আত্মীয় স্বজন, জ্ঞাতিগুষ্টি চিন্যা রাখতে হয়, বিপদে আপদে আপনা রক্তের মানুষ কামে লাগে। এদিকে জমিজমার খোঁজ করেছিল, সম্পত্তি বিনিময়ের চেষ্টাও হয়েছিল একটু, তারপর বলেছিল–আমাগো আর আহন হইব না। ভাল লাগে না রে মনু, এই দ্যাশ বড় রুঠা! পাকিস্তান উঠে যাবে কিনা সে খোঁজখবরও একটু নিয়েছিল বাবা। মা পাঠিয়েছিল আমসত্ত্ব, গোকুল পিঠে আর নতুন কাপড়। মাসখানেক পরে বনগাঁয়ের সীমানা পর্যন্ত বাবাকে এগিয়ে দিয়ে এসেছিল শ্যাম। মনু, ভালো থাইকো–এই কথা বলে এদেশের সীমা ডিঙিয়ে গেল।

এখন এই যে লোকটা তাকে চিঠি লেখে, তার ভালমন্দের খবর নেয়–এ লোকটা কে! বাবা? কিরকম বাবা! তার মুখ মনে পড়ে না, ভিন্‌দেশী এক অচেনা লোক, ভিটের মায়া ছেড়ে আসতে পারেনি–এ লোকটার সঙ্গে তার সম্পর্ক কি? শ্যামের বাক্সে বাবা-মার একটা জোড়ের ফটো আছে। পিছনে রাজবাড়ির সিন্ ফেলা, পাশে ফুলের টব, সূতীর ঢোরাকাটা একটা কোট গায়ে, ধুতি আর পাম্পশূ পরা গ্রাম্য লোকটা বুক চিতিয়ে বসে আছে পাশে ধোয়া পাট-ভাঙা জংলা-পেড়ে শাড়ি-পরা মা-জবুথবু, ছোট্ট একটুখানি মানুষ, ক্যামেরার লেনসের দিকে কৌতূহলী চোখ। বিশ্বাস হতে চায় না যে এঁরা শ্যামের মা-বাবা, এঁরাই তার জন্মের কারণ এঁরাও তো জানেন না শ্যাম কে, কিংবা কোথা থেকে এল!

না, বহুকাল আর সেই ছবি বের করে দেখে না শ্যাম, আগে মায়ের জন্য কাঁদতো, পরীক্ষা দিতে যাওয়ার আগে কিংবা নতুন চাকরিতে যাওয়ার সময়ে প্রণাম করে যেতো ঐ ছবি। তারপর আস্তে আস্তে কর্পূরের গন্ধের মতো মন থেকে মুছে গেছে ঐ দুটি মুখ। মনে পড়ে না, আর তেমন করে মনে পড়ে না। কেবল মাঝে মাঝে হরিধ্বনি দিয়ে যখন মড়া নিয়ে যায়, তখন চমকে উঠে মনে পড়ে কুয়োতলা, ঘাটে যাওয়ার মেঠো পথ, করমজার গাছ, পগারে লাফিয়ে পড়ছে ব্যাঙ; মনে পড়ে, প্রকাণ্ড এক অন্ধকারের মধ্যে উত্তরের ঘরের দাওয়ায় ছোট্ট একটু হ্যারিকেনের আলো করে মা বসে আছে– মুখের চামড়ায় নেমেছে শিকড়বাকড়, কথা বলতে গেলে মাথা

কাঁপে–সামনের অন্ধকার, এক– আকাশ, অস্পষ্ট নক্ষত্র, আর রক্তের মধ্যে অতি দুর্বোধ্য মৃত্যুর হিম অনুভব করতে করতে অসহায় মা বীজমন্ত্র ভুলে গিয়ে বিড়বিড় করে বলে চলেছে–মনু, মনু রে, অ মনু মনু ...মনু, মনু রে, অ মনু ....

মনে মনে শ্যাম প্রশ্ন করে–তুমি আমার কে? তোমরা কারা? না, আমি তোমাদের চিনি না। তারপর চমকে ওঠে সে অস্থির হয়ে আবার বিড়বিড় করে বলে–তোমরা ভাল থেকো। বেঁচে থেকো। আমার জন্য চিন্তা কোরো না আমি ভাল আছি। আমি খুব ভাল আছি। দেখো, একদিন খুব সুসময় এসে যাবে। ভাল জমিতে আমরা তুলবো ঘরবাড়ি, তৈরি করবো বাগান, মাছ ছেড়ে দেবো পুকুরে, ছাড়া জমিতে বসিয়ে দেবো জ্ঞাতিদের ঘর, এক-আধজন বোষ্টম, আর ধোপা নাপিত। দূর বিদেশ থেকে আমি তোমাদের কাছে ফিরে আসবো, আমি নৌকো বোঝাই করে নিয়ে আসবো সুদিন.....। সেই কবে ছেলেবেলায় শোনা ঘুমপাড়ানি গান গুন গুন করে শ্যাম–মায়রে দিলাম ডবল শাঁখা, ভাই করাইলাম বিয়া, বাপরে দিলাম সোনার মটুক, তীর্থ কর গিয়া .....

।। ৭ ।।

ঠিক দুপুরবেলা গড়িয়াহাটার মোড় থেকে একটা লোকের পিছু নিল শ্যাম। অকারণে। লোকটা কালো, হাড়গিলে রোগা চেহারা অত্যন্ত কর্কশ তার মুখ, সেই মুখে মোটা গোঁফ, চোখে গগল্‌স; পরনে টেরিকটনের গাঢ় রঙের চাপা চোঙা প্যান্ট, গায়ে ঝকঝকে ক্রীম রঙের সিল্ক শার্ট, হাতে ফোলিও ব্যাগ। চমৎকার ঝকঝকে পোশাকের ভিতরে কালো হাড়গিলে লোকটাকে বেমানান এবং আরো কুচ্ছিত দেখাচ্ছিল–যেন কারো জামাকাপড় চুরি করে এনে পরেছে।

লোকটা বাটার দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ জুতো দেখল, তারপর শ্লথ গতিতে হেঁটে গেল মোড় পর্যন্ত, সিগারেটের দোকান থেকে কিনে নিল এক প্যাকেট সস্তা সিগারেট, কাপড়ের দোকানের ডামির দিকে চেয়ে একটু হাসল আপনমনে, একটা কানা ভিখিরিকে তাড়া দিল, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করল একটি সুন্দরী মেয়ের চলে-যাওয়া। তারপর ধীর গতিতে পার হয়ে ট্রাম স্টপের দিকে চলে যাচ্ছিল লোকটা।

আগাগোড়া লোকটাকে লক্ষ্য করছিল শ্যাম। মনে হয় খুব সহজ শান্ত ও ভদ্র জীবন যাপন করে না লোকটা। চারদিকে ওর সতর্ক চোখ ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভিড়ের মধ্যে ও ধরনের লোকই ভদ্রলোকদের পকেট হাতড়ে দেখে কিংবা নিদেন সবার অলক্ষ্যে মেয়েদের নরম বুক ছুঁয়ে সরে যায়। একটা কিছু এ ধরনের কাজ করবেই লোকটা । শ্যাম নিশ্চিত। সামান্য উত্তেজনা বোধ করে শ্যাম। লোকটাকে চোখে চোখে রাখে, পিছু নিয়ে এসে ট্রাম স্টপে দাঁড়ায়। লোকটা সবুজ রুমাল বের করে অকারণে ঘাড় গলা মোছে, স্টপে দাঁড়ানো মেয়েদের লক্ষ্য করে–চোখেমুখে চিকমিক করে ওঠে কামনা-বাসনা। কিন্তু কিছুই করে না লোকটা।

ট্রামে উঠেও লোকটা খুব ভদ্রভাবে দাঁড়িয়ে থাকে–মেয়েদের কাছে ঘেঁষে না, ভদলোকদের পকেটের দিকে তাকায় না।

এন্টির চাদরের ভিতরে শ্যামের হাত মুঠো পকিয়ে যায়, সে মনে মনে বলে–এবার একটা কিছু করো হে আমি তোমার অপেক্ষায় আছি। ভয় কি! ঐ যে মোটা মতো লোকটা–পরনে ধুতি পাঞ্জাবি, ঘাড়ের চুল পুলিসদের মতো করে ছাঁটা, লক্ষ্য করে দ্যাখো লোকটা ঢুলছে। ওর বুক-পকেট থেকে মুখ বের করে আছে একটা খাম। ওটা তুলে নাও। কিংবা ঐ যে মেয়েটা উঠে দাঁড়ালো–পরনে মভ রঙের শাড়ি, মাথায় বিড়ে–খোঁপা, ওর চোখমুখ দ্যাখো –সুন্দর নয়, কিন্তু বাঘিনীর মতো কামুকা–জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটা ওর স্বভাব–ওর গায়ে তুমি নিশ্চিন্তে হাত দিতে পারো–কিছুই হবে না। ভয় কি?

কিন্তু লোকটা খুব ভদ্রভাবে দাঁড়িয়ে থেকে একটু কুঁজো হয়ে জানালা দিয়ে বাইরের রাস্তাঘাট দেখবার চেষ্টা করে। শ্যাম হতাশ হতে থাকে। এমন পাকা বদমাসের মতো চেহারা তোমার!–শ্যাম বলতে থাকে– তুমি শুধু চোখ দিয়ে যে–কোনো মেয়েকে গর্ভবতী করে দিতে

আর তার একটু অনিশ্চিত চোখ আর নগ্ন দুটি হাত ঘুরে বেড়াচ্ছে ক্লান্তহীন টেলিফোনের চাবি থেকে নোট বই, খোলা কাগজ এবং আবার টেলিফোনে। দুটি কাজের হাত তারা–স্বয়ংক্রিয়। তবু শ্যাম দেখে, যেন পিয়ানোর চাবি ছুঁয়ে যাচ্ছে।

শ্যামের আশেপাশে যারা বসেছিল, তারা প্রত্যেকেই কোনো না কোনো কাজে এসেছে, তাই একটু পরে পরে প্রত্যেকেরই ডাক এল। ভিতর থেকে, এবং এইভাবে আস্তে আস্তে তার আশপাশ খালি হয়ে গেল। এক সময়ে দেখল শ্যাম যে, সে একা বসে আছে। আর রিসেপশনের মেয়েটি তার অত ব্যস্ততার মধ্যেও মাঝে মাঝে তাকে লক্ষ্য করছে

খুব অবাক হয়ে শ্যাম টের পায়, তার বুকের মধ্যে রেলগাড়ির সেই স্টেশন ছেড়ে যাওয়ার শব্দ–ধীরে থেকে দ্রুত হয়ে যাচ্ছে। সামান্য তেষ্টা পাচ্ছিল তার। পকেটে হাত দিয়ে দেখল সিগারেট নেই। কাঁচের দরজা ঠেলে দুটি চটপটে মার্কিন ভদ্রলোক ঘরে আসে, কাউন্টারের সামনে দাঁড়ায়, নীচু স্বরে কী একটু রসিকতা করে। মেয়েটি হেসে তার সমাপ্রতিভ চোখেমুখে জবাব দিয়ে দেয়। আবার শূন্য হয়ে যায় ঘর। কিছু একটা লিখে রাখতে গিয়ে কোনো ভুল ধরা পড়ায় মেয়েটি জিভ কেটে পরিষ্কার বাংলায় বলে 'এঃ মা!' চকিতে একপলক শ্যামকে লক্ষ্য করে চোখ নামিয়ে নেয়। টেলিফোন শব্দ করে উঠলে অবলীলায় টেলিফোন তুলে নিয়ে তুখোড় ইংরিজীতে বলে–ওঃ বোস .... মিস্টার বোস! ইয়েস মিস্টার বোস...হিয়ার হি ইজ...থ্যাঙ্ক ইউ। আবার চকিতে চোখাচোখি হয়ে যায়।

আস্তে আস্তে অস্বস্তি পেয়ে বসে শ্যামকে। সেই এই প্রথম টের পায় অনেকদিন হয়ে গেল সে আর নিজেকে সাজায় না। অযত্নের বাগানের মতো বন্য হয়ে গেছে তার শরীর, পুরোনো পুঁথিপত্রের মতো ঝুরঝুরে হয়ে গেছে চোখের চাউনি। এণ্ডির চাদরের তলায় তার স্খলিত হাত আর পেট থেকে বুক পর্যন্ত সন্তর্পণে নিজেকে পরীক্ষা করে দেখে–না, কোনোখানে নেই সেই পুরোনো শ্যাম। বস্তুতঃ তার মনে হয় এই-যে লোকটা সে–এণ্ডির চাদর গায়ে, গালে দাড়ি, ভিতরে অস্থির এক রেলগাড়ির পুল পেরিয়ে যাওয়ার গুম্ গুম্ শব্দ–একে কোনোকালে কখনো চিনত না শ্যাম। ঐ মেয়েটির সামনে ধরাপড়া অসহায় এক অচেনা লোক বসে আছে।

কি ভাবছো তুমি? আমি বাইরের দুপুরের রোদ এড়াতে কৌশলে তোমাদের এই ঠাণ্ডা সুন্দর ঘরে ঢুকে বে-আইনীভাবে বসে আছি? কিংবা আমি বদমাস, তোমাকে সুন্দর দেখে তোমার মুখোমুখি বসে আছি, সময়মতো হতো বা পিছু নেবো? কিংবা আমি যে চোর-জোচ্চোর মতলববাজ নই সে সম্বন্ধে তুমি নিশ্চিত হতে পারছো না? শ্যাম মনে মনে এই সব কথা বলে মেয়েটিকে। যেন বা একা একটি ঘরে সুন্দরী মেয়েটির মুখোমুখি তাকে বসিয়ে রেখে এক ধরনের মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা চালানো হচ্ছে।

সে সহ্য করতে পারে না। সামনের টেবিলে রাখা এক স্তূপ পত্র-পত্রিকা থেকে একটা ছবির কাগজ তুলে নিয়ে তার ওপর মুখ নীচু করে রাখে। সিগারেট নেই–সে কথা ভুলে গিয়ে পকেটের দিকে হাত বাড়াতেই চটাস করে শব্দে–হাত পা কেঁপে ওঠে তার।

এইসব ছোটোখাটো অথচ গুরুতর ঘটনা ঘটে যেতে থাকলে শ্যাম প্রাণপণে চেষ্টা করে মেয়েটার দিকে আর না তাকানোর। কিন্তু তারপর একটা সময় এল যখন আর ভিজিটর আসছিল না, টেলিফোনেও আর কোনো শব্দ নেই, শূন্য ঘরে মেয়েটি ও সে দুরন্ত নিস্তব্ধতার মধ্যে বসে ছিল।

তারপর টেলিফোনের ক্র্যাডেল থেকে রিসিভার তোলার শব্দ, তারপর দ্রুত ডায়াল করবার মিষ্টি শব্দ হচ্ছিল। তখন মেয়েটি ব্যস্ত আছে ভেবে সন্তর্পণে একবার চোখ তুলেই ভয়ঙ্কর চমকে উঠল শ্যাম। মেয়েটি বাঁ হাতে টেলিফোনটা কানের কাছে ধরে রেখেছে, ডান হাতের সামনের রিসেপশন কাউন্টারে একটা হলুদ পেন্সিল ধরে আছে কিন্তু সে এক দৃষ্টে চেয়ে আছে শ্যামের দিকে। চোখ পড়তেই সে পেন্সিলটা রেখে দ্রুত তার ডান হাত তুলে মাউথপীসটা চাপা দিল, পরমুহূর্তে সে পাখির মতো তীক্ষ্ণ মিষ্টি গলায় সোজা তাকে প্রশ্ন করল–হুম্ ডু ইউ ওয়ান্ট, প্লীজ?

মাথার ভিতরের হঠাৎ ঘোলা জল টলমল করে ওঠে। কাকে চাই! আমি কাকে চাই! তীব্র আবেগে থরথর করে শ্যামের হাত পা কেঁপে ওঠে। মুহূর্তেই ভুলে পেয়ে বসে তাকে। মনে পড়ে না কাকে চাই, কিছুতেই তার মনে পড়ে না। শুধু মনে হয় এতক্ষণ এইখানে এই-সুন্দর সাজানো-গোছানো ঘরে সুন্দর মেয়েটির মুখোমুখি বেমানান বসে থেকে সে এদের শৌখীন সুন্দর কোনো আবহাওয়াকে নষ্ট করে দিচ্ছিল– বাস্তবিক সে কেন এখানে বসে আছে! কেন বসে আছে?

সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল শ্যাম। তার গলা আটকে আসছিল শুধু মাথা নেড়ে জানাল–না, সে কাউকেই চায় না। সে কারো জন্য বসে নেই। এখানে তার কোনো কাজ নেই।

দরজার দিকে কয়েক পা হেঁটে যায় শ্যাম। দাঁড়িয়ে পড়ে। ভয়ে শিউরে ওঠে তার গা। লক্ষ্য করে, হাঁটবার সময়ে দরজাটা সরে যাচ্ছে। বাঁ থেকে ডাইনে। আবার বাঁয়ে। বড় অদ্ভুত! শ্যাম দ্রুত চোখ বুজে ফেলে। আবার হেঁটে যায় কয়েক পা। চোখ খুলে দেখে সে কাউন্টারের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটি ভ্রূ সামান্য তুলে তাকে দেখছে। যেন প্রশ্ন করতে চায়–তুমি কে?

আমি কে! স্মৃতিহীন নির্বোধ শিশুর মতো শ্যাম অবাক চোখে অচেনা চারদিকে চেয়ে দেখে। বড় অসহায়ের মতো হাত বাড়িয়ে একটা চেয়ারের হাতল কিংবা একটা টেবিলের কিনারা খোঁজে সে। তার ঠোঁট নড়ে ওঠে, সে বিড়বিড় করে বলে–প্রশ্ন কোরো না আমি কে! আমি জানি না। বৃষ্টির জলের মতো দুঃখে তার বুক ভরে ওঠে–আমি জানি না আমি কেন গাছ হয়ে জন্মাইনি! জানি না আমি মাছ হয়ে জন্মালেই বা কী ক্ষতি ছিল।

চেয়ার থেকে ধীরে উঠে দাঁড়ায় মেয়েটি–লে' মি হেল্‌প ইউ!

বুকের ভিতরে আর্তস্বরে কথা বলে শ্যাম–না। আমাকে ছুঁয়ো না। মুখে কথা ফোটে না, তাই সে কেবল মাথা নাড়ে-না। তারপর এক-পা এক-পা করে পিছু হেঁটে যায় শ্যাম। কাচের পাল্লায় হাত রাখে। সাদা মুখে ঘাবড়ে যাওয়া মেয়েটি তার দিকে চেয়ে থাকে।

পাল্লা ঠেলে রোদ আর লোকজনের ভিতরে বেরিয়ে আসে শ্যাম। ফুটপথে দাঁড়িয়েও সে বিড়বিড় করে বলে–প্রশ্ন কোরো না আমি কে! আমি জানি না।

তারপর শ্যাম হঠাৎ 'ইয়াঃ' বলে হেসে ওঠে। মাথা নাড়ে–না, কোনোখানেই নেই লুকিয়ে থাকবার নিরাপদ জায়গা, কিংবা পালিয়ে যাওয়ার সহজ পথ। সব জায়গাতেই তার জন্য অপেক্ষা করছে ঐ প্রশ্ন –তুমি কে!

না, শ্যাম জানে না। শ্যাম সত্যিই জানে না।

অনেকক্ষণ বাদে তার ফেরানো পিঠে হাত রাখল অরুণ–কি ব্যাপার! বাইরে কেন?

–এমনিতেই! শ্যাম ম্লান হাসে।

–ভিতরে তোকে খুঁজে না পেয়ে চমকে গিয়েছিলুম! শেষে রিসপেশনের মেয়েটি দেখিয়ে দিল যে, তুই বাহিরে দাঁড়িয়ে আছিস। বলে সুন্দর ঠোঁটের কোণায় একটু হাসি দাঁতে কামড়ে ধরল অরুণ–দেখলি–

–কি?

অরুণ বড় চোখে তাকায়–তোমাকে আমি চিনি না শালা! আমি ইচ্ছে করেই দেরী করছিলুম, ঠিক জানতুম তোর এক্স-রে আই, এ-ফোঁড় ও ফোঁড় করে দেখে নিবি! তবে এটা তেমন নয়, বুঝলি! মিস্ দত্ত আরো হট্! এ নতুন। বলতে বলতে চিকমিক করে ওঠে অরুণ–আলাপ করবি? আমার সঙ্গে কয়েকদিনের যাতায়াতেই খুব খাতির। নাম-লীলা ভট্টাচার্য। করবি আলাপ?

–না। শ্যাম মৃদু হেসে মাথা নাড়ে– না।

শ্যাম ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল দরজার কাঁচের পাল্লা দিয়ে রাস্তা থেকেও মেয়েটিকে দেখা যাচ্ছে। মেয়েটির কৌতূহলী চোখ আবার তার চোখে পড়ল। শ্যাম ঘাড় ফিরিয়ে নেয়।

–কী হল তোর শ্যাম! জিভ দিয়ে চিক্‌চিক্ একটা শব্দ করে অরুণ।

–কি জানি! হাঁটতে হাঁটতে শ্যাম বলল–কোনখানে কিছু একটা গোলমাল হয়ে গেছে

আমার।

ভ্রূ কুঁচকে অরুণ বলে–কি রকম!

–হাইস্কুলে পড়ার সময় মেয়ে দেখলে যেমন হত অনেকটা সেরকম নার্ভাস বোধ করছিলুম। মেয়েটি জিজ্ঞেস করল আমি কাউকে চাই কিনা। অমনি মনে হল ওখানে বসে থেকে আমি অন্যায় করছি, চোরের মতো উঠে এলুম। অথচ এর চেয়েও কত তুখোড় কেতাওয়ালা জায়গায় আমি অনায়াসে গেছি সেদিনও, কাউন্টারের ওপর ঝুঁকে এরকম মেয়েদের বলেছি,'হেল্লো'...

জিজ্ঞাসার চোখে শ্যামের দিকে তাকায় অরুণ।

–গোলমাল হয়ে গেছে। শ্যাম মাথা নাড়ে–অনেকদিন বাদে আমি টের পেলুম যে, আমি প্রেমে পড়ে যেতে পারি।

লীলার?

–না। লীলা বলে নয়। যে কোন মেয়ের। আশ্চর্য! এতকাল যখন বৃন্দা মাধবী কিংবা ইতুর সঙ্গে ঘুরেছি, শুয়েছি এক বিছানায়, আগাপাশতলা তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি ভাল লাগার মতো কিছু পাওয়া যায় কিনা তখনো আমাকে বুকের মধ্যে রেলগাড়ির শব্দ হয়নি কখনো। মনে হয়নি যে, এর মধ্যে কোন রহস্য আছে আর। মনে হয়, কোনো কিছুই বাকী রাখিনি বলে আমার ঠিক তৃপ্তি কখনো হয়নি। বুকের কাছে কোথাও একটা দুঃখ চাপ বেঁধে আছে।

–কী সব বলীছস রে?

–ঠিক বলছি। শ্যাম মাথা নীচু রেখে বলে–কে যেন বলেছিল, ঈশ্বরজ্ঞান না হলে মেয়েদের ঠিকমতো চেনা যায় না! কে বলেছিল বল তো!

–কি জানি! ঠোঁট ওল্টায় অরুণ–রামকৃষ্ণ-কৃষ্ণ কেউ হবে!

–হবে!

একটু চিন্তিতভাবে মৃদু হাসে অরুণ–এক লীলা ভট্টাচার্যই তোকে ঈশ্বরজ্ঞান দিয়ে দিল আধ ঘন্টায়!

–না। শ্যাম হাসে–আমি শুধু এটুকু বুঝলুম যে, আমার ভিতরে এখনো এত আশ্চর্য রেলগাড়ির শব্দ আছে, আর আছে অতৃপ্তি। মনে হয় মেয়েরাই আমাকে ঠকিয়েছে সবচেয়ে বেশী। সবকিছু নিয়েও আসল রহস্যটুকু আঁলে বেঁধে নিয়ে গেছে। কিংবা কি জানি, হয়তো সে রহস্যও আমার সামনে খোলা চিঠির মতো মেলে-ধরা ছিল। আমি ধরতে পারিনি। তাই মেয়েটা যখন প্রশ্ন করল আমি কাউকে চাই কিনা তখন হঠাৎ নিজেকে ভিখিরি বলে মনে হল, মনে হল আমার নাম-পরিচয় নেই। আমি এত তুচ্ছ ইন্‌সিগ্‌নিফিক্যান্ট্ যে, আমার জন্য না হলেও কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি ছিল না। আমি বুঝতে পারছিলুম না, আমি গাছ হয়ে কেন জন্মাইনি, আমি কেন হইনি জলের মাছ?

ধীরে ধীরে দাঁড়িয়ে পড়ল অরুণ–শ্যাম!

–কথা বলিস না অরুণ। শ্যাম আস্তে বলল–আমি নিজেকে এতকাল ভীষণ ইম্পোর্ট্যান্ট ভেবে এসেছি। আমার সবকিছুই খুব সহজে পাওয়ার কথা–আমি ভেবেছিলুম। শ্যাম মৃদু হেসে মাথা নাড়ে–যা পেয়েছিলুম তা ভুল। আমাকে এতকাল সবাই ঠকিয়ে এসেছে। নইলে কেন আমার বুকের ভিতরে এখনো রেলগাড়ির শব্দ? আমি কেন মাঝে মাঝে দরজা খুঁজে পাই না? গাছের ছায়া খুঁজে পাই না? কোথায় ভুল হচ্ছে? এতকাল তো আমার সব দরজাই ছিল চেনা, সহজে খুলেছি... হঠাৎ ভালবাসার জন্য আবার আমার হাঁটু গেড়ে বসতে ইচ্ছে করছে।

চোখ কপালে তোলে অরুণ–কী ব্যাপার বল তো!

ক্লান্তভাবে হাসে শ্যাম–কিছু না।

–ধুস্ শালা! অরুণ হো হো করে হাসে, হাসতে হাসতে নিজের পেটের দিকে আঙুল দেখায়– সবকিছুর মূলে ঐ পেট! বায়ু থেকেই তোর সবকিছু হচ্ছে। রোজ রাতে ইসবগুলের ভূষি খাবি, সকালে উঠে গরমজলে লেবুর রস। আমি যখন ব্যাচেলর ছিলুম তখন আমার পেটের

কমপ্লেনই ছিল এগারো রকমের... লীলা ভট্‌চার্যকে আমি বলে রাখব যে, তুই সেইন্ট্ অ্যান্ড মিলারের এক্স-ছোটসাহেব। ভাল খেলোয়াড়-উভয়ার্থে। বলে রাখব যে, তুই দাড়ি না কামিয়ে চাঁদর গায়ে ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াচ্ছিস, ভুল করে যেন তোকে ছেড়ে না দেয়। ....

এসপ্ল্যানেডে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে হাত তুলে ' হেঃ ট্যাক্সি ....' বলে ট্যাক্সি দাঁড় করায় অরুণ। শ্যামকে বলে চল তোকে পৌছে দি।

হাই তোলে শ্যাম, বলে–নাঃ। বাসায় ফেরার তাড়া নেই। আমি একটু ঘুরে–ফিরে যাবো। তুই যা।

ট্যাক্সির দরজা বন্ধ করার আগে অরুণ নীচু গলায় বলল–যদি মনে ধরে থাকে তো লেগে যা। আমি দেখব। ..চাকরির জন্য ভাবিস না শ্যাম, আমার শ্বশুরের ফার্ম, আমি যাওয়ার আগে বুড়োকে পগিয়ে যাবো, তোর ব্যবস্থা হয়ে যাবে। বলতে বলতে ভীষণ বদমাসের মতো হাসে অরুণ–শরীরটা কেমন দেখছিস আমার? ভাল না?

–আঃ ফাইন! শ্যাম হাসে।

–ফর অ্যামেরিকা, দি ল্যাণ্ড অব্ ফ্রি সেক্স! দেখিস, ষাট বছর বয়সেও আমি শরীর রেখে দেবো! চিয়ারিও....

চলন্ত ট্যাক্সি থেকে হাত দেখায় অরুণ। বিদেশী এক অরুণ যাকে ঠিক ঠিক চেনে না শ্যাম অথচ চেনা বলে মনে হয়।

শূন্য মনে হেঁটে যায় শ্যাম। তার মাথার মধ্যে ভ্রমরের শব্দের মতো দূরাগত এক মোটর সাইকেলের আওয়াজ ঘুরে বেড়ায়। অস্থির বোধ করে সে। খ্রীস্‌মাসের জন্য সাজানো দোকানপাট রঙীন কাগজের শেকল, বুড়ো সান্টা ক্লস আর নকল পাইন গাছ চোখের পাশ দিয়ে সরে যায়। হ্যাণ্ডবিলে বিজ্ঞাপন বিলি করছে একটা লোক। শ্যামের হাতেও সে একটা কাগজ গুঁজে দেয়। তাতে ইংরেজীতে বড় হরফ লেখা–আপনার বিপদ কেটে গেছে.. তারপর একটা ওষুধের গুণ–বর্ণনা। মৃদু হেসে কাগজটা দুমড়ে ফেলে দেয় শ্যাম–মনে মনে গুন্ গুন্ করে শ্যাম–আঃ, আমার বিপদ কেটে গেছে! বিপদ আর নেই।

।। ৮ ।।

ফিরবার সময়ে সেকেণ্ড ক্লাস ট্রামের জানালার ধার ঘেঁষে বসা একটা লোক মাথা নীচু করে তাকে আদাব দিল। পরনে পায়জামা, লক্ষ্ণৌ-এর কাজ করা পাঞ্জাবি আর মাথায় মোটা সুতোয় বোনা নেট্-এর একটা গোল টুপি, যা মাথার সঙ্গে চেপে বসেছে। চোখে সূর্মা। ইরফান!

–ইরফান! কেমন আছো!

শ্যাম ট্রামে উঠতেই লোকটা খুব বিনয়ের সঙ্গে হেসে উঠে দাঁড়িয়ে জায়গা ছেড়ে দিল–বসুন চক্রবর্তী বাবু।

শ্যাম বসল না, ইরফানের কাঁধে আলতো করে হাত ছুঁইয়ে বলল–আরে তুমি বোসো। বোসো।

ইরফান মৃদু হেসে বলল–কী খবর?

ইরফানের মুখে আবার সেই বিনয়ের হাসি–আজকাল আসেন না আর!

না, অনেককাল শ্যাম আর যায় না রাজাবাজারের ইরফানের কাছে। যাওয়ার দরকার হয় না। আগে প্রতিমাসে যেতে হত। আড়াইশ টাকা জমা দিলে ইরফান তার ঢাকার এক আত্মীয়কে চিঠি লিখে দিত–"আমাদের দক্ষিণের বাগানে এবার খুব আম হইয়াছে। বানিখাড়ার কমলাক্ষ চক্রবর্তীকে দুইশত আম পাঠাইয়া দিবেন।" আর বাবা ঠিকঠাক দুই শ'টাকা পেয়ে যেতো ওখানে।

–কাজ-কারবার কেমন। শ্যাম জিজ্ঞেস করে।

–মন্দা। হুণ্ডি ধরে ফেলেছে। নীচু গলায় বলে ইরফান। হাসে–এখন কারবার সাহাবাবুদের হাতে আর ঢাকার মাড়োয়ারী।

কোনো কথাই ভাল করে শুনছিল না শ্যাম। একটা অন্ধকার মাঠ পেরিয়ে যাচ্ছে ট্রাম, হু হু করে হাওয়া লাগে। শ্যাম বয়স্ক ইরফানের সূর্মা-টানা সঙের চোখের মতো চোখে চোখ রেখে চেয়ে থাকে। ভদ্রতার হাসি হাসে।

পার্ক স্ট্রীটে নেমে গেল ইরফান। নামার আগে হঠাৎ কানের কাছে মুখ এনে বলল-যদি পাকিস্তানে যাওয়ার দরকার পড়েতো বলবেন। হাতে ভাল এজেন্ট আছে, বর্ডার পার করে দেবে, আবার দশদিনের মাথায় ফিরিয়ে আনবে। কোনো ভয়-ডর নেই। বলবেন।

পার্ক স্ট্রীটে নেমে গেল ইরফান। যাওয়ার সময়ে আবার আদাব দিল রাস্তা থেকে।

ইরফান নেমে গেল হঠাৎ শ্যামের মনে পড়ল যে, লোকটা মুসলমান। মনে পড়ল যে, সে হিন্দু। আশ্চর্য! সে যে হিন্দু এ কথাটা অনেকদিন হয় তার খেয়ালই ছিল না। মনে পড়েনি- আমি হিন্দু। মনে পড়তেই শ্যাম সামান্য হেসে ওঠে-আশ্চর্য আমি হিন্দু! কেমন হিন্দু আমি! হিন্দু হয়ে আমি কেমন আছি!

অনেক ভেবেও শ্যাম শব্দটার কোন অর্থ খুঁজে পেল না। অবিশ্বাস্য মনে হয় যে, সে হিন্দু। সে ভারতীয়। কিংবা সে বাঙালী। অবিশ্বাসী মনে হয় যে, সে কমলাক্ষ চক্রবর্তীর ছেলে, সাকিন-বানিখাড়া ঢাকা জেলা। অবিশ্বাস্য মনে হয় যে, শ্যাম চক্রবর্তী নামে কেউ সেইন্ট মিলারের প্রাক্তন ছোটোসাহেব কিংবা ক্লাবের এককালের লেফ্‌ট আউট। অবিশ্বাস্য মনে হয় যে, এইসব নাম পরিচয়ের মধ্যে সে বাঁধা আছে। অবিশ্বাস্য মনে হয় যে, এইসব নাম-পরিচয়ের বাইরে তার আর কোন অস্তিত্ব নেই।

কুয়াশার ভিতর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে ট্রাম, ময়দান পেরিয়ে যাচ্ছে অস্পষ্ট চাঁদের আলোয়। শ্যাম জানালার কাঠে মাথা হেলিয়ে দেয়। তারপর ক্রমে লক্ষ্য ভুলে গিয়ে তার ট্রামগাড়ি অচেনা অজানায় পাড়ি দেয়। চারদিকে চাঁদ আর কুয়াশায় মায়া, হু হু করে কেঁদে ওঠে প্রকাণ্ড নিষ্ফলা মাঠে, গাছে ভূতুড়ে ছায়া পাথরের মতো জমে আছে।

-টিকিট্।

বিরক্ত শ্যাম হাত তুলে কন্ডাক্টরকে সরে যেতে বলে। কন্ডাক্টর সরে যায়।

মায়াবী ট্রামগাড়ি চেনা পথ ছেড়ে দিয়ে বেঁকে যায়, ঘুরে যায় অচেনায়। গাছপালা ডেকে ওকে -এসো শ্যাম! বাতাস ফিস্ ফিস্ করে বলে- এসো শ্যাম! তারপর তাকে ছুঁয়ে আনন্দে বাতাস ছুটে যায় গভীরতর রাজ্যের ভিতরে; পাহাড়ে গুহায় নদী কিংবা সমুদ্রের ওপর দিয়ে সুগন্ধের মতো ভেসে যায় সুসংবাদ-শ্যাম আমাদের শ্যাম! মাটিতে পা রাখতেই মায়ের মতো মাটি ডেকে ওঠে-শ্যাম! পাখিরা চোখ থেকে গড়িয়ে পড়া জলের মতো শিশির জমে আছে ঘাসে। কাল-কাসুন্দীর ঝোপে, কুলবড়ই গাছের তলায় কুয়োর পাড়ে আতাবনে বাদুড়ের মতো ঝুলছে অন্ধকার, চক্‌মক্ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে জোনাকি পোকা। নোনাপুকুরের আঁশটে গন্ধ পায় শ্যাম, শাপলার গায়ের গন্ধ নিথর রাতকে চমকে দিয়ে জলে ঘাই দেয় বড় মাছ, তারপর শান্ত জলের নীচে পরীদের গভীর রাজ্যে চলে যায় তার অতিকায় নিঃশব্দ গতিময় ছায়া।

দূরে গঙ্গায় বেজে ওঠে জাহাজের ভোঁ। মাথার ওপর উড়োজাহাজের বিষণ্ণ শব্দ। শ্যাম অন্যমনে সাড়া দিয়ে-যাই।

ময়দানে পাশ ঘেঁষে যেতে যেতে মাত্র কয়েক পলকের জন্য স্বপ্নের সেই দেশ শ্যামের চেতনাকে ছুঁয়ে গেল।

ক্লান্ত শ্যাম ট্রাম থেকে নেমে ধীর পায়ে পেরিয়ে গেল গড়িয়াহাটার মোড়। তার গা ঘেঁষে বুড়ো গেঞ্জীওয়ালা উল্টোদিকে হেঁটে যায়, ধীরে গম্ভীর স্বরে হাঁকে-গেঞ্জী.....!

কয়েক পা হেঁটে যায় শ্যাম, তারপর শোনে হতাশ এক গেঞ্জীওয়ালা স্বর টেনে চলেছে- গেঞ্জী! দূরে চলে যাচ্ছে সেই ডাক। মাথার ভিতরে হঠাৎ আবার টলমল করে ওঠে ঘোলা জল, কিন্তু মনে পড়ে না, মনে পড়ে না-

আবার কয়েক পা হেঁটে যায় শ্যাম, তারপর ধীরে ধীরে দাঁড়িয়ে পড়ে, অস্ফুট গলায় বলে

ওঠে– সোনাকাকা!

ঘুরে দাঁড়িয়ে ভিড় ঠেলে উজিয়ে আসতে চেষ্টা করে শ্যাম। কিন্তু ততক্ষণে বহুদূরে চলে গেছে গেঞ্জীওয়ালার ওই ডাক। শ্যাম মাথা নেড়ে আপনমনে বলে–আঃ সোনাকাকা!

তার মনের মধ্যে বুড়ো মুখ তুলে ছানি–পড়া চোখে বে-ভুল চেয়ে থাকে সোনাকাকা–আঃ মনু! মাথা নেড়ে বলে–মনু রে!

তার কাঁধে হাত রাখে শ্যাম–সোনাকাকা, বাইচ্যা থাইকো। আরো কিছুদিন বাইচ্যা থাইকো।

বিড় বিড় করে কথা বলে শ্যাম–আমি নিয়ে আসবো সুদিন। অপেক্ষা করো।

হোটেলে মিত্রর সঙ্গে দেখা হলে মিত্র চোখ কপালে তুলে বলল–আজ একটা কাণ্ড হয়ে গেল মশাই ভালবাসার ব্যাপার খুব ইন্টারেস্টিং–

শ্যাম ভ্রু তুলে হাসল–বটে!

মিত্র ঝুঁকে বলল– মেয়েটি কুমারী থেকে এক লাফে বিধবা হয়ে গেছে। ডবল প্রমোশন।..... মাঝখানে মাসখানেক আসেনি, আজ এল, পরণে সাদা থান, হাতে চুড়ি নেই, কানে দুল,গলায় হার নেই, মুখচোখ থম্‌থম্ করছে। আমরা তো প্রথমে কিছু জিজ্ঞেসই করতে পারি না, এ ওর মুখ চাই–এই সেদিনকার কুমারী মেয়ে বিয়ে হয়নি, হঠাৎ এ কী? জিজ্ঞেস করতেই প্রথমে কেঁদে ভাসাল বলল– আমি বিধবা। আমার স্বামী মারা গেছে।..... কিন্তু বিয়ে হল কবে? জিজ্ঞেস করলে কেবল মাথা নেড়ে বলে –হয়েছিল।...কিন্তু কবে? অনেক কষ্টে তারপর মুখ ফুটল মেয়ের–বিয়ে হয়নি, কিন্তু হয়ে যেতো। আমি মনে মনে ওকে স্বামী বলে জানতুম আর কেউ কখনো কোনোদিন আমার স্বামী হবে না..... শুনলুম ছোকরা অ্যাকসিডেন্টে মারা গেছে মশাই...

বলতে বলতে মিত্র গম্ভীর হয়ে গেল হঠাৎ বলল– অদ্ভুত ব্যাপার মশাই, এই ভালবাসা! কী বলেন?

শ্যাম হাসে। হঠাৎ তার মাথার ভিতর আস্তে জেগে ওঠে ভমরের শব্দের মতো মোটর সাইকেলের আওয়াজ অ্যাকসিডেন্ট! কিরকম অ্যাকসিডেন্ট?

মিত্র অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলে–কী জানি, আজকাল লোকে বলে ভালবাসা–টাসা পুরোনো ঘায়ে খোঁচা লেগেছে মশাই! খুব মজা করলুম বটে অফিসে ব্যাপারটা নিয়ে, কিন্তু মনটা ভার হয়ে আছে। ভিতরে ভিতরে একটা হেমারেজ টের পাচ্ছি।

আবার অনেকক্ষণ চুপচাপ কেটে যায়। খাওয়া হয়ে গেলে আঁচিয়ে এসে একসঙ্গে বেরিয়ে পড়ে দু'জনে। চলে যাওয়ার আগে মিত্র হঠাৎ বলল– দেখুন, আমাকেও কিরকম বিধবা করে রেখে গেছে একজন। পুরুষ বলে থানটা পরিনি, কিন্তু ভিতরে ভিতরে... না মশাই, হাসবেন না, কিন্তু এক একদিন নিরালা ঘরে বসে খুব কাঁদতে ইচ্ছে করে।

অনেক রাতে ঘুম ভেঙে শ্যাম টের পেল রাস্তা দিয়ে একজন হকার গেঞ্জী হাঁকতে হাঁকতে চলে যাচ্ছে।

এত রাতে? মনে হতেই লেপ সরিয়ে জানালার কাছে এসে দাঁড়াল শ্যাম। বাঁ দিকে চেয়ে দেখল–রাস্তা শূন্য। ডানদিকে চেয়ে দেখল-রাস্তা শূন্য। তবু বহু দূর থেকে দূরে রাতের গভীরে চলে যাচ্ছে ঐ ডাক– গেঞ্জী ..... গেঞ্জী....

সোনাকাকা! নিজের কান চেপে অভিভূত শ্যাম স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

তারপর আস্তে আস্তে আকাশের দিকে চোখ তুলে দেখল শ্যাম। নিথর কালপুরুষ ছায়াপথ নক্ষত্রমণ্ডলী। আর সেই হিম আকাশে, নক্ষত্রে, তারা থেকে তারার ছায়াপথ পেরিয়ে রোগা, বুড়ো, প্রায়-অন্ধ সোনাকাকা ফেরি করতে করতে চলে যাচ্ছে তার সওদা গেঞ্জী.... গেঞ্জী.....!

BDeBooks.com

।। ৯ ।।

তেইশে ডিসেম্বর মোটর-সাইকেল দুর্ঘটনায় আহত এক ব্যক্তি আজ হাসপাতালে মারা গেছেন—এরকম একটা খবর পর পর কিছুদিন পত্রিকায় খুঁজে দেখল শ্যাম নেই। নেই। অথচ প্রতিদিন খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠা থেকে দুর্ঘটনার খবর থাকে। কতভাবে যে মরে যাচ্ছে মানুষ ইঁদুর আরশোলা কিংবা রোজ জল-না-পাওয়া চারাগাছের মতো দেখলে আশ্চর্য হতে হয়। এইভাবে মরে মরে যদি পৃথিবী ভিড় কমে যায়! যদি আস্তে আস্তে নির্জন হয়ে আসে পৃথিবী। ভাবতেই শ্যামের চোখেমুখে আনন্দ রক্তোচ্ছ্বাসের ঝাপটা এসে লাগে। তখন বড় সুন্দর হবে এই শহর, প্যারো রহস্যময়ী হবে পৃথিবী। তখন সব মানুষই হয়ে যাবে সব মানুষের চেনা পরিচিত আত্মজন। ভালবাসায় ভরে উঠবে পৃথিবী। থাকবে না প্রতিযোগিতা, আক্রমণ লোপ পাবে, তখন মানুষের ভাষা থেকে লুপ্ত হবে গালাগাল, অশ্লীল কিংবা কঠিন শব্দ। তখন দূরের মহাদেশ নিয়ে রূপকথার গল্প জমবে খুব। তখন আরো পাখি প্রজাপতি ও উদ্ভিদের জন্ম হবে পৃথিবীতে। পরিষ্কার সুগন্ধী বাতাস বয়ে যাবে। তখন পাওয়া যাবে দূরের শব্দ কিংবা গন্ধ, আর নিজেকে পাওয়া যাবে হাতের মুঠিতে। অল্প কিছু লোকের ভিতর থেকে সহজেই বেছে নেওয়া যাবে কয়েকটি বন্ধু, কিংবা নিজের স্ত্রীকে, আলাদা করে চেনা যাবে ভাঁড় কিংবা শয়তানকে, এখনকার মতো সব গোলামেলে মনে হবে না।

কিংবা যদি আরো নির্জন হয়ে যায় পৃথিবী! যদি ক্রমে ক্রমে জনশূন্য হয়ে যায় শহর, প্রান্তর, মহাদেশ! সমস্ত পৃথিবীতে আর একটিও মানুষ বেঁচে নেই একমাত্র শ্যাম ছাড়া!

ভাবতে ভাবতে শ্যাম ঘরের মেঝেয় ছড়ানো সিগারেটের টুকরোর ওপর পা ফেলে দ্রুত পায়চারি করে, লাথি মেরে সরিয়ে দেয় একটা বই, জ্বরো রুগীর মতো নিজের লম্বা জট-পাকানো চুল চেপে ধরে উঃ বলে হেসে ওঠে। আয়না তুলে ধরে নিজের ক্ষেপাটে অচেনা মুখের সামনে। হ্যাঁ, তখন? মানুষের তৈরী কলকারখানাগুলি গভীর ঘাসের সবুজে ডুবে যাবে, রেল-ইঞ্জিনগুলি জং ধরে আস্তে আস্তে মিশে যাবে মাটিতে, জাহাজ গলে জল হয়ে যাবে, এরোপ্লেনের গা জড়িয়ে উঠবে মাধবীলতা, উঁচু উঁচু বাড়িগুলির মাথায় জাতীয় পতাকার মতো উড়বে অশ্বত্থের পাতা, আমাদের কাঠের আসবাবগুলি আবার উদ্ভিদ হয়ে যাবে। একটি মানুষের জন্য থাকবে একটি সূর্য, চাঁদ এক-আকাশে নক্ষত্র, একটি পৃথিবীময় জল-স্থল-শূন্যময় খোলা জায়গা।

নিজেকেই বিড়বিড় করে প্রশ্ন করে শ্যাম। নিজেই উত্তর দেয়।

তখন কি তোমার খুব একা লাগবে না শ্যাম?

না! শ্যাম মাথা নাড়ে না!

তখন কাউকেই কি তোমার দরকার হবে না। শ্যাম! মায়ের মতো কেউ, কিংবা বৃন্দা, মাধবী, ইতুর মতো কেউ? শিশু-সন্তানের মতো কেউ? ভাইয়ের মতো কেউ?

না! শ্যাম মাথা নাড়ে না।

যদি তুমি তখন কথা বলতে ভুলে যাও। যদি ভুলে যাও গান গাইতে। কিংবা ভুলে যাও ভাষার ব্যবাহার! রতিক্রিয়া ভুলে যাবে? চিঠি লেখা? তোমাকে প্রশংসা করার লোক থাকবে না! এমন কেউ থাকবে না যে তোমাকে সুন্দর দেখে? তোমার কাছে থেকে দূরে যাওয়ার কেউ থাকবে না? থাকবে না কাছে আসার কেউ?

না! শ্যাম মাথা নাড়ে না।

তারপর শ্যাম আস্তে হেসে ওঠে। আয়নার নিজের মুখের দিকে চেয়ে নিজেকে একটি ধাধ জিজ্ঞেস করে—

বল তো এমন একা কে? জল স্থল শূন্যময় যার অখণ্ড পরিসর! যে আত্মস্বজনহীন! যার নেই দূরে যাওয়ার বা কাছে আসার কেউ? কে এমন স্বয়ংসম্পূর্ণ শ্যাম?

শ্যাম বিড় বিড় করে বলে—আমি।

আবার খবরের কাগজ তুলে নেয় শ্যাম। হতাশভাবে মাথা নাড়ে। না লোকটি মরেনি

হয়তো কিছু হয়নি লোকটার। সে হয়তো আড়াল থেকে শ্যামকে লক্ষ্য করে যাচ্ছে, অপেক্ষা করছে একটি মুহূর্তের– যখন শ্যাম কোনো রাস্তার বাঁকে মোড় নেবে, তখন তার হাতের আয়নার রোদ ঝলসে উঠে পড়বে শ্যামের মুখে।

না, লোকটা মরেনি। শ্যাম নিশ্চিত। সে জানালার কাছে এসে দাঁড়ায়। রাস্তাটা ভাল করে দেখে নেয়। ঐ তো চেনা পেট-মোটা বেঁটে লাল ডাকবাক্সটা রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে, ল্যাম্পপোস্টে লাগানো চৌকো বাক্সের গায়ে সিনেমার বিজ্ঞাপন, চেনা লাল হলুদ সাদা কয়েকটা বাড়ি দত্তদের বাগানে খেলছে কাক আর সিঁড়িতে শুয়ে আছে পাঁচটা বেড়াল, দুটো ট্যাক্সি গেল পর পর, পিছনে মন্থরগতি এক ঠেলাওয়ালা,একটি দুটি মেয়ে আর কয়েকজন শান্ত নিরীহ চেহারার লোক, সকালের রোদ চারদিকে ফসলের মতো ফলে আছে। কোনোখানেই সন্দেহের কিছু নেই, তবু শ্যাম টের পায়, এই সব কিছুর আড়াল থেকে দুটি চোখ তাকে চোখে চোখে রাখছে।

কেমন সেই লোক যার মুখে শ্যাম আলো ফেলেছিল? মিনুর মতোই নিষ্ঠুর কেউ কি? তার মুখ দেখেনি শ্যাম, লক্ষ্য করেনি তার গায়ের রঙ, জানে না সে কতটা লম্বা কিংবা তার বাড়িতে কে কে আছে, কে জানে সে সুবোধ মিত্র অফিসের সেই কুমারী বিধবা মেয়েটির প্রেমিক কিনা। কিংবা কে বলতে পারে যে লোকটা মিনু নয়। কিংবা নয় তার সঙ্গীদের একজন!

শ্যাম মনে মনে বলে– তবু পৃথিবী থেকে লোকজন ঢের কমে যাওয়া ভাল। আরো শালিক আরো চড়াই আরো উদ্ভিদের, আরো ভালবাসা, রহস্য ও স্বপ্নের বড় প্রয়োজন আমাদের।

একদিন এস প্ল্যানেডের খোলা রাস্তার হঠাৎ অসময় বৃষ্টি নামল। অকালে। গোপনে মেঘ জমেছিল আকাশে শ্যাম টের পায়নি। হঠাৎ খেয়াল করল তার চারপাশে হরিণের খুরের শব্দ। চরাচর জুড়ে ছুটে আসছে অজস্রী অসংখ্য হরিণ। হাঁওয়ার সামান্য গতিতে ছুটে যাচ্ছে তার চারপাশ দিয়ে।

শ্যাম ছুটে গিয়ে দাঁড়াল একটা গাড়ি-বারান্দার তলায় এক পাল লোকের ঠাসাঠাসি ভিড়ের মধ্যে। ময়লা, ভ্যাপসা গন্ধওয়ালা রুমালটা পকেট থেকে বের করে বহুদিন পর কাজে লাগল, শ্যাম চুল আর দাড়িতে জল মুছে নিল। ঠাণ্ডা হাওয়ায় বড় শীত করে উঠল তার। সে ভিড়ের ভিতরে একজন মোটাসোটা লোক খুঁজে দেখল যার পিছনে দাঁড়ানো যায়। নেই। পকেটে হাত দিল সিগারেটের জন্য। নেই। আর্কেডের তলায় খুঁজল একটা সিগারেটের দোকান। পেয়ে গেল। মন্থর পায়ে ভিড় ঠেলে দোকানটার সামনে এসে দাঁড়াতেই ভয়ঙ্কর চমকে গেল শ্যাম। প্রায় চার ফুট চওড়া একটা দোকান–জোড়া আয়না–অজস্র মাথা ও মুখের ভগ্নাংশ দেখা যাচ্ছে, সে নিজের সম্পূর্ণ অচেনা ভিখিরির মতো কাঙাল মুখ দেখতে পাচ্ছি, আর দেখল পিছনের ভিড় থেকে একটি আধোচেনা মুখ ঘাড় ঘুরিয়ে সামান্য কৌতূহলী চোখে তাকে দেখছে। একটি মেয়ে। সিগারেটের জন্য খুচরো পয়সা– ধরা বাড়ানো হাত থেমে রইল, শ্যামের বুকের ভিতরটার শূন্যতার মধ্যে চমকে ওঠে তার হৃৎপিণ্ড, রেলগাড়ির আওয়াজ শুরু হয়ে যায়।

মুখ ফিরিয়ে শ্যাম মেয়েটির দিকে তাকাতেই মেয়েটি কৌশলে অন্যমনস্কতার ভান করে সরিয়ে নিল চোখ, তারপর খুব সাবধানে যেন বিশ্রী না দেখায় এমনভাবে ধীরে মুখ ফিরিয়ে নিল।

বয়ঃসন্ধির সময়ের মতো লাজুক হয়ে গেল তার হাত-পা। সমস্ত শরীর কাঁটা দিল।

চেনে শ্যাম। মেয়েটিকে সে চেনে। কিন্তু কোথায় দেখেছিল ঐ অসম্ভব সুন্দর মুখ! ঐ কপাল–ঢাকা চুল গোল মুখ, মুখে নিঃশব্দে কথা–জানো আমি খুব বেঁচে আছি! আমার এখনো বয়স হয়নি। আমার কাছে অদেখা পৃথিবী অনেক বড় রয়ে গেছে দেখা–পৃথিবীর চেয়ে।

ঐ মুখ কোথায় দেখেছিল শ্যাম? কবে? মাথার ভিতরে ঘোলা জল টলমল করে উঠে। কোথায়?

পিছন থেকে কেবল মেয়েটির একটু দীর্ঘ বাঁকা ঘাড় দেখা যাচ্ছিল। সে পরেছে হাল্কা নীল রঙের শাড়ি, মেটে সিঁদুরের রঙের যার পাড়ে, কাশ্মীরী একটা স্কার্ফ গলায় জড়ানো। হাত দুটি বুকের ওপর মুড়ে রাখা, পিছন থেকে ভাল বোঝা যায় না, হয়তো সে বুকের ওপর কিছু একটা

চেপে ধরে আছে। হয়তো তার ব্যাগটা। বোঝা যায় যে সে একা।

একটু লালচে আভার চুলের বড় খোঁপা তার যার ওপর কয়েক বিন্দু বৃষ্টির জলে বজ্র-বিদ্যুৎ আর অহংকার ফুটে আছে নিঃশব্দে।

আর একবার তার মুখখানা দেখতে ইচ্ছে করে শ্যামের। কিন্তু মেয়েটি মুখ ফেরায় না। যেন অদৃশ্য কোনো থামে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এমনি অলস এবং অবহেলার ভঙ্গী তার।

খুচরা পয়সাগুলি আস্তে আস্তে পকেটে রেখে দেয় শ্যাম। মৃদু হেসে সে বিড় বিড় করে বলে– তোমাকে এমন কোথাও দেখেছি যেখানে তোমকে মানায় না। তাই তোমাকে মনে করতে আমার কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু দাঁড়াও, আগে ভাল করে তোমাকে দেখতে দাও–

কিন্তু কাছে যেতে সাহস হয় না শ্যামের। সে ভিড়ের ভিতরে গা-ঢাকা দেয়, একটু কুঁজো হয়ে ভিড় ঠেলে এগোতে থাকে, অর্ধ চক্রাকারে ঘুরে যেতে থাকে মেয়েটির সামনের দিকে নিজেকে মেয়েটির কাছ থেকে যথেষ্ট দূরে রাখার চেষ্টা করে। ভিড়ের মধ্যে বিরক্ত মানুষেরা তার দিকে চেয়ে দেখে। শ্যাম গ্রাহ্য করে না।

বুড়ো এক পাঞ্জাবীর পা মাড়িয়ে দেয় শ্যাম, বাচ্চা একটা ছেলের পিঠে হাত রেখে তাকে সরিয়ে দেয়, পাশাপাশি দাঁড়িয়ে কথা বলছিল দুটি ছেলে, তাদের ঠেলে মাঝখান দিয়ে এগিয়ে যায় সে। তার মুখ বাঁ দিকে ঘোরানো, চোখ লক্ষ্যবস্তুর ওপর স্থির। ক্রমে তার চার পাশ মানুষেরা ছায়ার মতো অলীক হয়ে আসে যেন আর কারো কোনো অস্তিত্ব নেই। শুধু ক্রমে ক্রমে মেয়েটির ছোট কানের ইয়ারিং থেকে গালের ডৌল, একটু চাপা নাক, ঠোঁট ক্রমে গোল সম্পূর্ণ মুখটি চলে আসে তার চোখের নাগালে। সে দাঁড়িয়ে পড়ে।

ফুটপাতের ধারে চলে এসেছিল শ্যাম। তার গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে বৃষ্টির জলকণা, হু-হু বাতাস তার এণ্ডির চাদর নিশানের মতো ওড়াতে থাকে। কনকন করে ওঠে কান। শ্যাম গ্রাহ্যও করে না। একটা চোর-বেড়ালের মতো সে মেয়েটির দিকে চেয়ে থাকে। তার সমস্ত চেতনা জুড়ে দূরগামী হরিণের পায়ের শব্দের মতো বৃষ্টির শব্দ হয়ে যেতে থাকে।

মেয়েটির গা ঘেঁষে চলে যায় কয়েকটি পুরুষ। হাত-পা রি রি করে ওঠে শ্যামের। কী সাহস। আবার অনেকদিন পর শ্যামের মনে হয় যে, বহুদিন হয়ে গেল সেই আর নিজেকে সাজায় না। তার গালে রুক্ষ দাড়ি, মাথায় লম্বা জটার মতো জড়িয়ে থাকা এলোমেলো চুল, গায়ে ময়লা এণ্ডির চাদর। সে অনেক রোগা, লাবণ্যহীন আর দুর্বল হয়ে গেছে। তার আর সেই সাহস নেই সহজেই যে-কোনো মেয়ের কাছাকাছি চলে যাওয়ার। কোথায় গেল সেই ভেলার মতো ভাসমান হাল্কা মন! সেই খেলার ছল! এখন তার বুকের মধ্যে সেই রেল গাড়ির স্টেশন ছেড়ে যাওয়ার আর পুল পেরিয়ে যাওয়ার শব্দ। সে নিজের বুকে হাত রাখে। না, এই অচেনা রহস্যময় শ্যামকে চেনে না শ্যাম। তার শরীরের ভিতরে, মনের ভিতরে ডেকে উঠছে মেঘ, চমকে উঠছে বিদ্যুৎ, আর সমস্ত চেতনা জুড়ে নেমে আসছে অদ্ভুত এক নিঃশব্দ বৃষ্টি। বুক ভরে ওঠে। ভরে ওঠে ভালবাসায়। ছোঁয়া যায় না। এখন আর শরীর ছোঁয়া যায় না। কাঁটা দেয়।

মেয়েটির চোখে হঠাৎ চোখ পড়ে যায় শ্যামের। ভ্রূ কুঁচকে মেয়েটি তাকে এক পলক দেখে, তারপর অস্বস্তিতে চোখ সরিয়ে নেয়। সামান্য এক-আধ পা সরে যায়, একটু ঘুরে দাঁড়ায়। শ্যাম আবার ভিড় ঠেলে এগিয়ে যায় ফুটপাথের ধার ঘেষে, আবার মেয়েটির মুখোমুখি হয়, মেয়েটির চোখ আবার তার চোখের ওপর ঘুরে যায়। সামান্য নড়ে ওঠে মেয়েটি, শীতে কিংবা ভয়ে সামান্য কেঁপে ওঠে। মুখ ফিরিয়ে নেয়। অসহায়ের মতো হঠাৎ চারদিকে চেয়ে দেখে। বিরক্তিতে কামড়ে ধরে ঠোঁট, মাটিতে পা ঘষে নেয় রাগে।

হঠাৎ শ্যামের খেয়াল হয় যে, তার চারপাশে কর্থাবার্তার শব্দ থেমে গেছে। অনেকেই লক্ষ্য করছে তাকে। কথা থামিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে অনেক লোক তার দিকে তাকিয়ে আছে, চোখ সরিয়ে দেখে নিচ্ছে মেয়েটিকে। তাদের চোখে মুখে কৌতুক। ভীষণ চমকে ওঠে শ্যাম, তার হাত পা কেঁপে ওঠে। সে নিজের দিকে চেয়ে দেখে–কী করেছে সে। এতক্ষণ সে কী করেছে!

চকিতে শ্যাম মুখ ফিরিয়ে নেয়। তার নাকে মুখে ছুটে আসে রক্তের গরম ঝাঁপটা। অপমানে কেঁপে ওঠে তার শরীর। দ্রুত সে ফুটপাথ ছেড়ে বৃষ্টির রাস্তায় নেমে পড়ে। হেঁটে যেতে থাকে।

তারপর কেবল হরিণ আর হরিণ। চারদিকে অজস্র অসংখ্য ধাবমান অদৃশ্য হরিণের পায়ের শব্দ। যতদূর চোখ যায়, বাষ্পাকার জলকণায় আধো-অন্ধকারে রাস্তাঘাট, ময়দান আদিগন্ত রহস্যময় হয়ে গেছে। নিশ্চিত মনে নিরুপদ্রবে হেঁটে যায় শ্যাম। তার মাথা গাল দাড়ি বেয়ে নেমে আসে কেঁচোর মতো হিম জলের কয়েকটা রেখা। শীতে তার শীর কাঁপে। তবু সে টের পায় তার ভিতরে উষ্ণ রক্তস্রোত, বুকের মধ্যে উথাল-পাথাল, মাথার মধ্যে যন্ত্রণার মতো একটি প্রশ্ন—তুমি কে? তুমি কে?

হঠাৎ মনে পড়ে যায় শ্যামের। দুটি সাদা সুন্দর হাত টেলিফোন থেকে নোট বইয়ে ঝুরে বেড়াচ্ছে মদরঙের কাঠের পালিশে ছায়া ফেলে। নীলা!

ইয়াঃ বলে হেসে ওঠে শ্যাম। লীলাই! হায় ঈশ্বর! তোমার জন্যই আমি বৃষ্টির মধ্যে খোলা রাস্তায় নেমে এলুম! গায়ে তুলে নিলুম শীত!

হঠাৎ দুটি হাত ওপরে তুলে পাগলের মতো আপন মনে আবার হাসে শ্যাম—ঠিক আছে তোমার জিত।

অনেকদিন পর নিজেকে একটু জীবন্ত বলে মনে হয় শ্যামের। সে শুনতে পায় তার শরীরের মধ্যে কারখানা চলার মতো শব্দ করে চলেছে কলকব্জা। সে বড় বেঁচে আছে।

রাতে বিছানায় শুয়ে আধো ঘুমের ভিতরে সে তার বালিশের কাছে একটা নাম বলে রাখল। বালিশে নাক ঘষল। লীলা! আঃ—হাঃ!

।। ১০ ।।

নিজেকে লুকিয়ে রাখার কোনো চেষ্টাই করল না শ্যাম। খোলা রাস্তায় রোদের মধ্যে সে দাঁড়াল থামে ঠেস দিয়ে। অদূরে কাঁচের শাশী লাগান দরজাটা। চোখ থেকে রোদ-চশমা খুলে নিল শ্যাম। প্রথমে ভাল দেখা গেল না, বেলা তিনটের খর রোদ চোখ ধাঁধিয়ে দিল। হাত দিয়ে চোখ আড়াল করল সে। তারপর ছায়া মূর্তির মতো আবছা লীলাকে দেখা গেল মদ-রঙের কাউন্টারের ওপাশে। প্রথমে চেনা গেল না লীলাকে। তার মুখ চোখ ঝাপসা দেখা যাচ্ছিল, লীলার পিছনের দেওয়ালে একটা ফ্লুরেসেন্ট আলো জ্বলছে। তারপর ক্রমে ক্রমে দেখা গেল সেই দুটি সুরে বাঁধা হাত, স্বয়ংক্রিয়, কাজ করে যাচ্ছে। কপাল থেকে চুর্ণ চুল সরিয়ে দিচ্ছে লীলা, ডান হাতে তুলে নিচ্ছে পেন্সিল, বাঁ হাতে টেলিফোন, রিসিভার কানে চেপে কাত হয়ে শুনছে কিংবা একটু ক্লান্ত দীর্ঘ মিষ্টি স্বরে বলছে 'হেঃ.... লেলা.....' দুটি চোখে সামান্য ঘুম পাওয়া ভাব। ভ্রূ তুলে কথা বলছে তার নানা অতিথির সঙ্গে, হেসে ঠাট্টার উত্তর দিয়ে দিচ্ছে। তবু কিছুতেই তাকে এই পৃথিবীতে ব্যবহৃত মেয়ে বলে মনে হয় না শ্যামের, মনে হয় না যেন সে খাওয়া-পরার জন্য উন্নতির জন্য, সঞ্চয়ের জন্য কাজ করছে। মনে হয় না একটি নাম কিংবা পরিচয়ে বাঁধা আছে সে।

শ্যাম সরল একটা গাছের মতো সামান্য একটু পিছনে হেলে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। মুখে মৃদু হাসি। তার সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে ছায়ার মতো অলীক লোকজন—যাদের কোনো অস্তিত্ব নেই, যেন ব্যাকেটে ঝোলানো জামা-কাপড়। চারদিকের কোনো শব্দও পায় না শ্যাম— যেন সে এক নিঝুম ঠাণ্ডা ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। সামনের কাঁচের দরজাটা ঠেলে লোকজন আসছে যাচ্ছে, কিন্তু কারো মুখই ভাল করে দেখে না শ্যাম। দুটি ভিখিরি এসে ঘ্যান ঘ্যান করল শ্যামের সামনে, তারা মেয়ে না পুরুষ তাও দেখল না শ্যাম, পকেট থেকে পয়সা তুলে দিয়ে দিল, কী দিল বা কত তা খেয়াল করল না। একবারও ঘড়ি দেখল না শ্যাম, ক'টা বাজে— এ প্রশ্ন তার কাছে অপার্থিব মনে হল। সে শুধু টের পাচ্ছিল যে, শুধু দু' পায়ের জোরে সে এখানে দাঁড়িয়ে নেই, আর তার ভিতরে জন্ম নেওয়ার আগে শিশুর মতো কোনো বোধ কেঁপে উঠছে। এগ্রির চাদরের তলায় তার সমস্ত শরীর শক্ত, লোহার মতো কঠিন হয়ে আছে সমস্ত পেশী, মাঝে মাঝে তার চোয়ালের হাড়

ঢিবির মতো ফুলে উঠছে। আর ক্রমান্বয়ে বুকের ভিতরে নিঃশব্দে ঘটে যাচ্ছে অদৃশ্য বৃষ্টিপাত,আর হরিণ দৌড়ে যাওয়ার শব্দ। সে টের পায় সে বড় বেঁচে আছে।

লীলা কাজ করে যাচ্ছে। কেবলই কাজ করে যাচ্ছে। নড়ে যাচ্ছে তার দুটি কাজের হাত, তার ঠোঁট কেবলই কথা বলে যাচ্ছে। কোন কথাই বুঝতে পারে না শ্যাম, তবু যেন বুঝতে পারে। হ্যাঁ, আমি জানি তুমি কী বলছো। তুমি দূর-দূরান্তের লোককে বলতে চাইছো–দেখ, আমি কত বেঁচে আছি। দেখ, আমার এখনো বয়স হয়নি। আমার কাছে এখনো বড় রহস্যময় এই জীবন। আমি ভালবাসতে শিখেছি।

মাঝে মাঝে তার সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক চোখ রাস্তার ওপর দিয়ে ঘুরে যাচ্ছিল হয়তো সে এক পলক দেখে নিল একটা লোকের কালো কোট, একটা গাছের একটু পাতা, দুই একটি কাক, একটা দেয়ালে সাঁটা মিছিলের আহ্বান।

শ্যাম অপেক্ষা করে রইল। এই ভিড়ের রাস্তায়, এত কিছুর মধ্যে তুমি আমার দিকে একবারও লক্ষ্য করবে কি!

শ্যাম টের পাচ্ছিল, আস্তে আস্তে আলো মরে আসছে। অন্ধকার হয়ে গেলে লীলা আর তাকে দেখতে পাবে না, কিন্তু তখন উজ্জ্বল ঘরের মধ্যে লীলাকে আরো স্পষ্ট দেখা যাবে। শ্যাম মুখে মৃদু হাসি আর ঋজু শক্ত শরীর নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। দাঁড়িয়েই রইল। হয়তো কিছুই ঘটবে না। হয়তো বিস্ফোরণের মতো কিছু ঘটবে। শ্যাম জানে না।

লীলার মুখ আড়াল করে একটি লোক কাউন্টারে ঝুঁকে দাঁড়াল একটু ক্ষণ। সরে গেল। লম্বা একটা লোক শ্যামের সামনে রাস্তায় দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাচ্ছিল। কয়েক পলক আবার আড়ালে পড়ল লীলার মুখ। বিরক্তিতে আট ফুট লম্বা হয়ে যেতে ইচ্ছে করছিল শ্যামের সেই ইচ্ছে টের পেয়েই বোধ হয় লোকটা তাড়াতাড়ি হেঁটে গেল। সামান্য চমকে উঠল শ্যাম–মিনু না? পর মুহূর্তেই লোকটাকে ভুলে গিয়ে লীলার ওপর চোখ রাখল। লীলার চারদিকে ক্রমে আলোর উজ্জ্বলতা বাড়ছে, নিঃশব্দে শ্যামের চারদিকে নেমে আসছে অন্ধকার।

আর একটু হলেই অন্ধকার সম্পূর্ণ গ্রাস করে নিত শ্যামকে। এ সময়ে লীলা নোট টুকে রাখতে গিয়ে বাধা পেয়ে বাঁ হাতে টেলিফোন নিয়ে মুখ তুলতেই তার চোখ শ্যামের ওপর আটকে গেল। পলকে পাথর হয়ে গেল লীলা, মুখ সামান্য ফাঁক করে সে চেয়ে রইল, চীৎকার করে ওঠার আগের মতো ভয়ে তার ডান হাত উঠে এল মুখের কাছে, যেন সে এক্ষুণি লোক জড়ো করে ফেলবে। কয়েকটি ভয়ঙ্কর মুহূর্ত ধরে সে শ্যামের ছায়ার মত মূর্তির দিকে চেয়ে রইল। তারপর শ্লথ হয়ে নেমে গেল তার হাত, কাউন্টারের ওপর সেই হলুদ পেন্সিল চেপে ধরল প্রাণপণে, চোখ বুজে সে দাঁত দাঁত চেপে টেলিফোনে কথা বলে গেল।

একটুও নড়ল না শ্যাম। সে মৃদু হাসল। শরীরের ভিতরে চালু কারখানায় শব্দ। সে বড় বেঁচে পড়ল কাউন্টারের ওপর। জোর করে নামিয়ে রাখা মুখ ঘাড়ের তেজী বাঁকের ওপর অহঙ্কার আর অবহেলা ফুটে আছে। শ্যাম লক্ষ্য করল। তার দুঃখ হচ্ছিল যে, সে আজও নিজেকে সাজায়নি। সাজলে আজ লীলা তাকে চিনতোই না। গালে রুক্ষ দাড়ি, গায়ে এন্ডির চাদর ধুতি আর স্যান্ডেল পরা এই চেহারা তার নিয়তির মতো, লীলার কাছে তাকে এভাবেই আসতে হবে, শ্যাম জানে। নইলে লীলা তাকে আর পাঁচটা লোকের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলবে, পেন্সিল, চেপে ধরবে না প্রাণপণে, চোখ বুজে ফেলবে না, নামিয়ে নেবে না মুখ, শ্যাম জানে।

আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হয়ে গেল লীলার ভঙ্গী। কিন্তু তার অলস ভাব রইল না, সে আর হাসল না এবং একবারও তাকাল না শ্যামের দিকে। সে শুধু মাঝে মাঝে আড়চোখে দরজাটা দেখে নিচ্ছিল বোধ হয় এই ভয়ে যে, শ্যাম যে কোনো সময়ে দরজা ঠেলে ঢুকে পড়তে পারে।

শ্যাম মৃদু হাসে। দাঁড়িয়েই থাকে। মাঝে মাঝে শুধু শরীরের ভর এ পা থেকেও ও পায়ে সরিয়ে নেয়।

অন্ধকার হয়ে এল। শ্যামের মাথার উপর টুক করে জ্বেলে উঠল রাস্তার আলো। শ্যামের

সামনে দাঁড়িয়ে একটা বেঁটে লোক, সে একটা দামী চোরাই কলম, কিনবে কিনা তা বিনীতভাবে জিজ্ঞেস করল। শ্যাম মাথা নাড়ল না। বস্তুতঃ কলম শব্দটাই সে ধরতে পারল না।

ক্রমশঃ সে বুঝতে পারছিল তার চার ধারে লোকজনের ভিড় বেড়ে যাচ্ছে, অফিস-ছুটির ভিড়। এবার অনেকেই তাকে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অবাক হবে। কে জানে এদের মধ্যে সেদিন বৃষ্টির বিকেলের দু'-একজন লোক আছে কিনা যারা তাকে আর লীলাকে চিনতে পারবে। মৃদু হাসল শ্যাম। তবু দাঁড়িয়েই রইল।

সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল, আস্তে আস্তে হাতের কাজ শেষ করে ফেলল লীলা। গুছিয়ে রাখল তার কাগজ। তারপর চুপ করে বসে রইল কিছুক্ষণ। দ্বিধা। এবার সে বেরিয়ে আসবে। সে উঠে দাঁড়াল। হঠাৎ ঝলমল করে উঠল তার হলুদ শাড়ি, শাড়ির সবুজ পাড়, সবুজ ব্লাউজ উঁচু চেয়ার থেকে নামতেই তাকে ছোটোখাটো দেখাচ্ছিল। সে ক্লান্ত ভঙ্গীতে কপালের চুল সরিয়ে কাউন্টারের ভিতর থেকে ধীর পায়ে বেরিয়ে গেল। তারপর আর তাকে দেখা গেল না।

কিছুক্ষণ পর কাঁচের দরজা ঠেলে ছায়ামূর্তির মতো বেরিয়ে এল রাস্তায়। শ্যাম দেখল তার সঙ্গে খাকী পোশাক পরা পিওন গোছের একজন লোক রয়েছে। সতর্কতা। লোকটা লীলার পাশাপাশি হেঁটে গেল। পিছু নিল শ্যাম। একটু দূরে থেকে দেখল বড় দ্রুত হাঁটছে তারা। লোকটাই একটা ট্যাক্সির সামনে দু'হাত তুলে দাঁড়িয়ে ট্যাক্সিটাকে দাঁড় করাল। একবারও ফিরে তাকাল না নীলা। চকিত ট্যাক্সির ভিতরের অন্ধকারে ঢুকে গেল। এত দ্রুত ঘটল এ-সব ঘটনা যে, শ্যামা তার ঘোর কাটিয়ে উঠতে না পেরে বোকার মতো দাঁড়িয়ে দেখল। দাঁড়িয়েই রইল। মুখে সেই মৃদু হাসি সমস্ত শরীরে শক্ত ঋজুভাব।

রাতে খাওয়ার সময় আবার মুখোমুখি মিত্রর সঙ্গে দেখা। বলল—অটোমেশন এসে যাচ্ছে মশাই। আমাদের অপশন দিয়ে সময়ের আগেই অবসর নিয়ে নিন কোম্পানী কমপেনসেশন দেবে মোটা টাকার। তা ভাবছি এবার বসেই পড়ি মশাই এত খাটাখাটনি যে কার জন্য তা বুঝতেই পারি না।

শ্যাম অন্যমনস্কভাবে হাসে।

—পনেরো বছরের ওপর চাকরি হয়ে গেল—বয়সের কথাটা বোধ হয় খেয়াল ছিল না মিত্রর তাই বলেই চকিতে একটু হাসল—সার্টিফিকেটে যা-ই থাক মশাই, আমার প্রায় চল্লিশ এখন, কিন্তু এখনই কেমন বুড়ো বুড়ো লাগে নিজেকে। অফিসে যতক্ষণ কাজকর্মে থাকি ততক্ষণ মনে হয় বাইরে বোধ হয় খুব আলো—বাতাস, হইহল্লা আনন্দের মচ্ছব চলছে, আবার বাইরে এসে সময় কাটতে চায় না। আগে ফুটবল খেলা দেখার ঝোঁক ছিল, একটু আধটু তাস দাবা খেলতুম না এখন আর তাও পরিশ্রম বলে মনে হয়। বইপত্রও ঘাটি না কতদিন! মাঝে মাঝে শুধু জ্যোতিষের বই খুলে নিজের হাত দেখি আর হাসি। বলতে বলতেই একটু ঝুঁকে পড়ল মিত্র সামান্য চাপা গলায় বলল—বিশ্বাস করুন মশাই আমার হাতে অনেক ভাল সাইন ছিল, সুন্দর সান লাইন আর বৃহস্পতির মাউন্ট —বলতে বলতে মিত্র তার এটো ডান হাতটার প্লেটের কাণায় একটু চেঁছে নিয়ে খুলে দেখাল—দেখুন না!

শ্যাম দেখল মিত্রর এবড়ে খেবড়ো হাত ভোতা নখ আর মাছের ঝোল লাগা কালচে একটা হাতের চেটো। বলল—বাঃ!

মিত্র হাসে—হাতের জন্যই কনফিডেন্স ছিল আমার, ভেবেছিলুম এর জোরে বেরিয়ে যাবো। তা ছাড়া দেখুন কূর্মপৃষ্ঠের মতো আমার লাইন অব হেড। শুক্রস্থান ভাল। হাতে প্রেমের চিহ্ন আছে—লাভ ম্যারেজ। কিন্তু ঠোঁট উল্টে হাসল মিত্র—কিছুতেই কিছু হয় না মশাই! চল্লিশে আমি রিটায়ারমেন্টের কথা ভাবছি! ছুটি নিয়ে গ্রামে-ট্রামে চলে যাবো, খুলবো একটা পোলট্রী, ডিম মুর্গী বেচবো। কী বলেন?

শ্যাম হাসে।

মিত্র মাথা নাড়ে—কিংবা রমতা যোগীও হয়ে যেতে পারি। ঠিক নেই। কেদারবদ্রী কাশীধাম

ঘুরে ঘুরে বেড়াবো। বড় ইচ্ছে ছিল মশাই ঘুরে বেড়াবার, কিন্তু কেমন যেন মন হয়নি, হাওড়া ব্রীজ পেরোবার কথা হলেই আলিস্যি ধরে, কতকাল যে রেলগাড়িতে চড়িনি।

বাইরে এসেও শ্যামের সঙ্গ ছাড়ল না মিত্র। বলল–চলুন অনেককাল পর আজ মনটা হাল্কা আছে একটু ঘুরে বেড়াই রাস্তায় খাওয়ার পর হাঁটা ভাল।

হাঁটতে হাঁটতে মিত্র কথা বলে–জীবনটাকে দেখতে হলে ঘরে আগুন লাগিয়ে দিতে হয় মশাই। ঘরে থাকলেই কেবল ভার-ভার ভয়-ভয় লাগে, কেবলই ট্রাঙ্ক–বাক্সে হাত বুলোই জানালা দরজা নেড়ে দেখি অকাজের চিন্তায় বুকে গর্ত খুঁড়ে ফেলি। অথচ আমার ভাবনার কিছু নেই–ঝাড়া হাত–পা, ভাই চাকরিতে বোনের বিয়ে হয়ে গেছে বুড়ো বাপ-মা নেই কিন্তু ঐ একটুখানি একখানা ঘরই আমাকে মেরে রেখেছে মশাই ওইটুকুরই বড় মায়া! বড় করে শ্বাস ছেড়ে মিত্র, ভাল করে চাদর জড়ায় গায়ে। বলে–ইচ্ছে ছিল ঘরটাকে অমন অনাবাদী ফেলে রাখবো না... হাঃ হাঃ ফলে–ফুলে ভরে তুলবো!

গোল পার্ক থেকে গড়িয়াহাটার দিকে ফিরে আসে দু'জন। পাশাপাশি হাঁটে। মিত্রই কথা বলে যায়।–অটোমেশন এসে গেল যন্ত্রপাতির হাতে কাজকর্ম বুঝিয়ে দিয়ে এবার আয়েসী মানুষদের ছুটি। এতদিনে বুঝি মশাই কাজকর্ম আসলে যন্ত্রপাতিরই মানুষে নয়।

শ্যাম হাসে। অন্যমনে হাঁটে।

–বিধবাতেও আমার আপত্তি ছিল না মশাই আমি শুধু শান্তশিষ্ট একজনকে চেয়েছিলুম, বয়স জাত রূপ কোনোটাই আমার দেখার ছিল না। কিন্তু কেবল মুখ ফুটে কাউকেই বলতে পারলুম না! বড় লজ্জা করে। একটু বেশী বয়সেই বিয়ের কথা ভেবেছিলুম, বয়স থাকার সময়ে ভাবতুম কেবল তার কথা, যে আমাকে দিব্যি দিয়ে নিজে সরে পড়েছে। আয়ুটা বড় লম্বা, কী বলেন? তা ঠিক বয়সে যখন বিয়ে করিনি এই বয়সে আর লোককে নিজের বিয়ের কথা কি করে বলা যায়...। বলি বলি করেও শেষ পর্যন্ত কোথায় যেন আটকে যায়। বলতে পারি না। লজ্জা করে।

গড়িয়াহাটার কাছে মিত্রকে ছেড়ে দিল শ্যাম। মিত্রকে একই সঙ্গে খুশী আর বিষণ্ন দেখাচ্ছিল। চলে যাওয়ার জন্য পা বাড়িয়েও পিছু হটে এল মিত্র বলল–আমাকে খুব অসহায় মনে করবেন না মশাই, আমি নিরস্ত্র নই। অনেক দিন থেকে নিজেকে সশস্ত্র রেখেছি আমি..... হাঃ হাঃ সময় থাকতেই জোগাড় করে রেখেছি পরিমাণ মতো ঘুমের ওষুধ সতেরোটা ট্যাবলেট আছে আমার, হ্যাঁ মশাই সতেরোটা! মায়ের ছিল না–ঘুমোনোর অসুখ, তখন থেকে চুরি করে জমিয়ে রাখা... জানতুম একদিন না একদিন কাজে লাগতে পারে মাঝে মাঝে শিশিটা বের করে নেড়েচেড়ে দেখি... হাতে নিলেই মশাই কেমন একটা জোর পাই, মনে বল–ভরসা এসে যায়, আর ভয় লাগে না...হাঃ হাঃ

তারপর গলা নামিয়ে বলল–দরকার হলে বলবেন। যা ট্যাবলেট আছে তাতে দু'জনের ঢের হয়ে যাবে। ইচ্ছে করলে আরও এক-আধজনকে বলে দেখবেন। অনেকেই রাজী হবে। আমি ফ্রি দেবো...হাঃ হাঃ

শ্যাম মৃদু হেসে বলল–নেবো। আমার দরকার হবে।

–আচ্ছা, বলে গম্ভীর মুখে মিত্র চলে গেল।

দূরে থেকে শ্যাম দেখল খয়েরী তুস চাদর গায়ে মাতাল একটা ভল্লুকের মতো মিত্র আলো-ছায়ায় হেঁটে যাচ্ছে তার জমিয়ে রাখা সতেরোটা ঘুমের বড়ির দিকে। তাকে পিছু ডাকতে ইচ্ছে হয় না। তাকে শ্যাম চলে যেতে দিল।

।। ১১ ।।

ঠিক দুপুরবেলায় ঘরে তালা দিয়ে বেরিয়ে পড়ল শ্যাম। সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে সিগারেট খুলে দেখল–শেষ সিগারেট। সেটা ধরিয়ে নিয়ে প্যাকেটটা শূন্যে ছুড়ে দিয়ে বা পায়ে নিখুঁত একটা সট করল সে। প্যাকেটটা রেলিঙ টপকে গিয়ে দেয়ালে লেগে পড়ল সিঁড়ির বুক ঘুরবার চাতালে, শ্যাম আপনমনে হাসল–গো-ও- ওল! রেলিঙে ঝুঁকে ভারসাম্য রাখল তারপর মসৃণ রেলিঙে হাত ছুঁইয়ে

তর তর করে সিঁড়ি ভেঙে নেমে গেল। পায়ে করে আবার সিগারেটের প্যাকেটটা টেনে নেয় সে। তারপর পায়ে পায়ে সেটাকে নিয়ে খেলতে খেলতে সিঁড়ি ভাঙতে থাকে–ইন আউট...ইন আউট আন উট–আপনমনে বলে সে। অনেক স্মৃতি অনেক কথা ও দৃশ্য ভাঙা শব্দ বুকের ভিতরে মাথার ভিতরে ঝিলমিল করে ওঠে তার। কচ্ছপের পিঠের মতো এক ঢল সবুজ মাঠ, একটা সাদা বল, আর সে ছুটছে আর ছুটছে... সামান্য হাসে সে শ্বাস টানে তারপর আবার নামতে থাকে।

বড় রাস্তায় এসে এসপ্ল্যানেডের বাস ধরল শ্যাম।

নির্দিষ্ট জায়গায় ল্যাম্পপোস্টের তলায় দাঁড়াল শ্যাম। চোখের রোদ-চশমা খুলে নিল। মৃদু হাসল।

আবছা দেখা যেতে লাগল লীলার অবয়ব। তারপর জলের গভীর থেকে যেভাবে আস্তে আস্তে মাছ উঠে আসে জলের ওপরে, তেমনি ধীরে ধীরে স্পষ্ট হতে লাগল সেই দুখানি সাদা ব্যস্ত হাত, গোল সুন্দর মুখখানা, কপাল–ঢাকা চুল আজ তার সাদা ব্লাউজ। মাথায় উঁচু করে বাঁধা মস্ত খোঁপা।

দাঁড়াতেই চোখাচোখি হয়ে গেল। চমকে উঠল না লীলা, মুখ ফাঁক হয়ে গেল না। বরং জুড়ে গেল ঠোঁটে ঠোঁট ভ্রূ কুঁচকে উঠল, দৃঢ় হয়ে গেল চোয়ালের হাড়। এক পলক দেখা হতেই সে তার চোখ সরিয়ে নিল। ব্যস্ত হয়ে গেল কাজে।

শ্যাম জানত এরকমই হবে। এরকমই হয়। মৃদু হেসে সে দাঁড়িয়ে রইল। ক্রমে অলীক এক আবছায়ার মধ্যে চলে যেতে লাগল তার চারপাশ পথ-চলতি লোকজন, লুপ্ত হয়ে গেল সময়ের বোধ। আর কেবলই রেলগাড়ির শব্দ হরিণের খুরের আওয়াজ, নিঃশব্দ এক বৃষ্টিপাতে ভরে আসে বুক শরীরের ভিতরে ধীর গম্ভীর মেঘ ডেকে ওঠে।

চোয়াড়ে চেহারার একটা লোক লীলার সঙ্গে কথা বলছে। লোকটার পরনে পাঢ় গরম প্যান্ট গায়ে সাদা সোয়েটার। লোকটা খুব ভদ্রভাবে হাসছে, কিন্তু তার মতলব শ্যাম পরিষ্কার বুঝতে পারে। সে নানা কথায় ভোলাচ্ছে লীলাকে। ঐ তো লীলার মুখচোখ কোমল হয়ে এল, স্বপ্ন দেখার মতো অলস হয়ে এল, চোখ দুটি ব্যস্ত হাত কয়েক মুহূর্তের জন্য স্থির হয়ে আছে কাউন্টারের ওপর। লীলার ঠোঁটে চাপা আনন্দের হাসি! বোধ হয় ঘরে আর কেউ নেই কিছুক্ষণের অবসর পেয়ে গেছে লীলা। টেলিফোনটাও বোধ হয় বাজছে না কিংবা বাজলেও উত্তর দিচ্ছে না লীলা।

লোকটাকে শ্যামের চেনা মনে হয়। অনেক্ষণ সে দেখে। সেই লোকটা কি শ্যাম যার পিছ নিয়েছিল। লোকটা ঐ বদমাস লোকটা এখানে কেন তা বুঝল না শ্যামা সে শুধু মনে মনে আর্তনাদ করে উঠল–কথা বোলো না। ওর সঙ্গে কথা বেলো না। কী কথা ওর সাথে? মুখ ফিরিয়ে নাও, কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। অনেক্ষণ ধরে তোমার টেলিফোন বেজে যাচ্ছে, উত্তর দাও। বাইরে সন্ধ্যে হয়ে এল তুমি কাজ সেরে নাও। ওর দিকে ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে বলো–আচ্ছা আপনি এখন আসুন...। কিংবা আরো কোনো কর্কশ কথা বলো লীলা, ওকে বের করে দাও। কিংবা আমাকে চোখের ইশারায় ডাকো আমি ভিতরে গিয়ে ওকে বের করে আনছি। আমি ওকে চিনি ও ভিড়ের মধ্যে লোকের একট হাতড়ে দেখে, মেয়েদের বুক ছুঁয়ে আসে ওর লোভী হাত। কথা বোলো না আর। লীলা চুপ করো। কী কথা ওর সাথে! তুমি কি জানো না যে, একজন তোমাকে দেখছে?

বোধ হয় টেলিফোন বাজল। লীলা একটু হেলে কানে চেপে ধরল টেলিফোন ডান হাতে সে হলুদ পেন্সিলটা ঠুকতে লাগল ডেস্কের ওপর তবু লোকটার দিকে চেয়ে আছে সে, মৃদু হাসছে। লোকটা সোয়েটারটা দু'হাত দিয়ে একটু টেনে নামায় ডেস্কের ওপর সামান্য ঝুঁকে পড়ে হাত বাড়ায় টেলিফোনটার দিকে। লীলা মাথা নাড়ে, পিছনে একটু হেলে সরে যায়। হাসে।

ওরা খেলছে–শ্যাম টের পায়। সমস্ত শরীর রি-রি করে ওঠে শ্যামের। আত্মবিস্মৃতি ঘটে যেতে থাকে। কী সাহস ওই লোকটার! কেবল কাছে দাঁড়িয়ে থেকে, কেবল কথা বলে বা কেবল চোখের দৃষ্টিতে ও নষ্ট করে দিচ্ছে লীলা পবিত্রতা।

আর লীলা জানে যে শ্যাম তাকে দেখছে। তবু তার ভ্রূক্ষেপ নেই। কিংবা কে জানে, লীলা তার ওপর প্রতিশোধ নিচ্ছে কিনা!

এক-পা এক-পা করে এগিয়ে যায় শ্যাম। কী করছে তা বুঝতে পারে না। দরজার খুব কাছ এসে সে দাঁড়ায়। কাচের পাল্লায় তার লম্বা, শীর্ণ, এলোমেলো পোশাক পরা চেহারার ছায়া ভেসে ওঠে। তার নিঃশ্বাসের ভাপ লেগে আবছা হয়ে যায় খানিকটা কাচ। তীব্র চোখে সে ভিতরের দিকে চেয়ে থাকে।

টেলিফোন রেখে সোজা হয়ে বসেই হঠাৎ শিউরে ওঠে লীলা, চীৎকার করে উঠতে গিয়েও মুখে হাত চাপা দেয়, অসহায় দুটি চোখ বিশাল হয়ে যায়। চোয়াড়ে চেহারার লোকটা বিদ্যুৎবেগে চিতাবাঘের মতো ঘুরে দাঁড়ায়। শ্যাম দেখে, তার দুটো হাত মুঠো পাকানো কিন্তু হতভম্বের মতো শ্যামের দিকে চেয়ে আছে। শ্যাম মৃদু হাসে। তারপর এক-পা এক পা করে পিছিয়ে আসে আবার। ল্যাম্পেপোস্টে হেলান দিয়ে দাঁড়ায় নিশ্চিন্ত মনে। শান্তচোখে চেয়ে থাকে হতভম্ব বিব্রত লোকটার দিকে। চোখ দিয়েই বুঝিয়ে দেয়– সাবধান! আমি পাহারায় আছি।

লোকটা একটুক্ষণ তাকে দেখে, তারপর অস্বস্তিতে চোখ ফিরিয়ে নেয়। লীলা মুখ নীচু করে বসে আছে। দু'জন স্যুট পরা সাহেব ভিতরে ঢুকে গেল। তার লীলার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলল। শ্যাম লক্ষ্য করে যে লীলার মুখ অল্প লাল, সে অনায়াসে হাসছে না আর, মাথা নেড়ে থমথমে মুখে প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিল। ঘর খালি হয়ে গেল আবার। চোয়াড়ে চেহারার লোকটা লীলার দিকে ফিরে কী যেন জিজ্ঞেস করল। লীলা মাথা নাড়ল–না। চোখ নীচু করে রইল। লোকটার মুখে সামান্য হতাশা ফুটে উঠছে। শ্যাম দেখে। লোকটা একটু ইতস্ততঃ করে, তারপর কাউন্টারের ওপরে রাখা ফোলিও ব্যাগটা নিয়ে বেরিয়ে আসে। দরজার বাইরে এসে লোকটা থমকে শ্যামের দিকে এক পলক তাকায়। শ্যাম গ্রাহ্য করে না। লোকটা বা দিকে হেঁটে চলে গেল।

নিশ্চিত মনে দাঁড়িয়ে থাকে শ্যাম। নড়ে না।

আস্তে আস্তে তার চারদিক অন্ধকার হয়ে আসে। ঘরের মধ্যে লীলাকে উজ্জ্বল দেখায়। বাচ্চা মেয়ের মতো অভিমানী গম্ভীর তার মুখ। শ্যাম হাসে। তার ঠোঁট নড়ে ওঠে–তোমাকে ওখানে মানায় না। ভেবো না, আমি তোমার জন্যেই একদিন পৃথিবীকে খুব নির্জন করে দেবো, চুপ করিয়ে দেবো সবাইকে। গভীর সরবনের জঙ্গলে ডুবিয়ে দিয়ে যাবো সমস্ত শহর। কে ওই লোক যার সঙ্গে তুমি কথা বলছিলে? ওরকম হৃদয়হীন চেহারার লোক পৃথিবী থেকে যত কমে যায় তত ভাল। তুমি কখনো ওই লোকের সঙ্গে দূরে যেও না।

কাজ শেষ হয়ে গেলে লীলা সতর্কভাবে একবার দরজার দিকে চেয়ে দেখল। তারপর একটা টেলিফোন করল। পিছন হেলান দিয়ে বসে রইল চুপচাপ। ঘরের মধ্যে দিয়ে যাওয়া আসা করল অনেক লোক, শ্যাম তাদের লক্ষ্য করল না। লীলার বসে থাকার ভঙ্গী দেখে বুঝতে পারল যে, সে কারো অপেক্ষায় আছে। মৃদু হাসল শ্যাম, কেননা সে জানে যে, তাতে লীলার কোনো লাভ নেই।

কিন্তু অনেকক্ষণ কেউ এল না। লীলা উঠে ভিতরে গেল, আবার ঘুরে এল, কাউন্টারের উপর ঝুঁকে দরজার দিকে পিঠ করে কিছু একটা দেখার ভান করে অপেক্ষা করল। আবার অস্থির ভাবে ঘরের মধ্যে একটু হেঁটে বেড়াল। তারপর ধীরে ধীরে দরজার কাছে এসে দাঁড়াল লীলা। পিছনে আলো, তাই লীলাকে ছায়ার মতো দেখায়। কাচের খুব কাছ ঘেঁষে দাঁড়াল লীলা। শ্যাম স্পষ্ট বুঝতে পারে, ওই অন্ধকার মুখ থেকে দুটি অদৃশ্য চোখ তাকে লক্ষ্য করছে, বলছে–কী চাও রাস্তার লোক? কী চাও অচেনা?

সে দুটি প্রশ্নই শুনতে পায় যেন। অমনি কেঁপে ওঠে তার শরীর ভুল পেয়ে বসে তাকে। সে বিড় বিড় করে বলে–আমি জানি না আমি কী চাই। আমি জানি না।

অস্থিরভাবে চোখ সরিয়ে নেয় শ্যাম। মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থেকে সে শুনতে পায় দূরের রাস্তায় বাঁক নিয়ে ছুটে আসছে একটা মোটর সাইকেল তারপর তার গতি কমে আসে, ধীরে ধীরে মোটর-সাইকেলটা তার ঠিক পিছনে ফুটপাথ ঘেঁষে দাঁড়ায়। নিথর হয়ে যায় শ্যাম। অবশ চোখে চেয়ে দেখে তার পাশ দিয়ে চটপট পায়ে একটি ছেলে চলে গেল কাচের দরজাটার দিকে। চাপা কালো প্যান্ট আর সাদা পুল-ওভার পরা, ছোটো করে ছাঁটা মাথার চুল একটু বেঁটে কিন্তু মজবুত

চেহারার ছেলেটি দরজার দিকে হাত বাড়াতেই যেন মন্ত্র বলে দরজা খুলে গেল। সেই প্রথম দিন শোনা একটু তীক্ষ্ণ কিন্তু মিষ্টি গলাটি শুনতে পেল শ্যাম–এত দেরী! কখন টেলিফোন করে বসে আছি...

ছেলেটি হাসে–এই বিশ্রী ট্র্যাফিকে আসা যায়? ঘুরে আসতে হল, তাও ক্লিয়ার রাস্তা পেলুম না... কি ব্যাপার?

–কই! কিছু না!

–কিছু না?

–না।

দু'জনে পাশাপাশি হেঁটে এল শ্যামের দিকেই। নড়ল না শ্যাম। লীলা ছেলেটির বাঁ পাশে ছিল, যে পাশে শ্যাম। কয়েক পা হাঁটার মধ্যেই লীলা কৌশলে ছেলেটির ডান পাশ সরে গেল। তারপর তাকে পেরিয়ে গেল তারা। শ্যাম ঘাড় ঘোরাল না। শুনতে পেল স্টার্টারে লাথি মারার শব্দ তারপর গুর গুর করে ডেকে উঠল মোটর-সাইকেল। দূরের দিকে ছুটে গেল। সরল একটি গাছের মতো সে দাঁড়িয়ে রইল। বাতাসে পেট্রলের গন্ধের সঙ্গে আর একটি মিষ্টি মৃদু গন্ধ, বোধ হয় পাউডারের। আগে অনেক পাউডারের গন্ধ চেনা ছিল শ্যামের। এখন ভুলে গেছে মৃদু হেসে সে মাথা নাড়ল–না সে এ গন্ধটা চেনে না।

তোমার কি অনেক প্রেমিক? ভাল কিন্তু দেখো একদিন পৃথিবী খুব নির্জন হয়ে যাবে। তখন তোমার লুকিয়ে থাকার নিরাপদ জায়গা থাকবে না, থাকবে না পালিয়ে যাওয়ার সহজ পথ।

ভিড়ের ভিতরে পথ করে ধীরে হাঁটছিল শ্যাম। হাঁটতে হাঁটতে বলছিল–আমি জানি না কি করে ভয় দেখাতে হয় চোয়াড়ে চেহারার বিশ্রী স্বভাবের লোকদের, আমি জানি কিভাবে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে হয় মোটর-সাইক্লিস্টদের। তুমি কেন দেখিয়ে দাওনি আমাকে! কেন ছেলেটিকে বলোনি যে, এই লোকটার জন্যই আমি রাস্তায় একা বেরোতে পারছিলুম। না! কিংবা তুমি সেই চোয়াড়ে চেহারার লোকটাকেও বলতে পারতে–আমাকে বাঁচাও।

হাঁটতে হাঁটতে অভিভূতের মতো হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে শ্যাম। কেন? পিছন থেকে চলন্ত একটা লোক তার গায়ে ধক্কা খায়। শ্যাম টাল খেয়ে হেসে ওঠে–কেন ধরিয়ে দাওনি আমাকে? তারপর আবার হেঁটে যায়।

বস্তুতঃ পৃথিবী খুব নির্জন হয়েই গেছে। খুব জীবন্ত মানুষজন শ্যামের চোখে পড়ে না। ব্র্যাকেটে ঝোলানো জামাকাপড় হেঁটে যাচ্ছে, ট্যাক্সি-ডার্মি করা মুখ কিংবা শরীর তার চোখে পড়ে। এলোমেলো আলোয় পড়ছে চলন্ত ছায়া, ভেঙে যাচ্ছে। নানা রাস্তায় ঘুরে বেড়াল শ্যাম। একটিও চেনা মুখ চোখে পড়ে না, একটিও প্রিয় মুখ চোখে পড়ে না। হঠাৎ মনে হয়, একশ বছর একটানা ঘুমিয়ে হঠাৎ জেগে উঠে সে আর কিছুই চিনতে পারছে না। একশ বছর ধরে পচে গলে ঝরে গেছে চেনা-পরিচয়, একশ বছর ধরে বিস্ফোরিত হয়ে গেছে প্রিয় মুখগুলি। অল্প কুয়াশা জমে আছে চারদিকে, বেশী দূরে চোখ যায় না। মনে হয় কুয়াশা কেটে গেলেই দেখা যাবে বিদেশ। দেখা যাবে, লীলা একা নির্জন রাস্তার শেষে কাঁচের দরজার ওপাশে তার অপেক্ষায় আছে। তাকে দেখলেই দরজা ঠেলে বেরিয়ে আসবে, তারপর তারা দু'জন পরিত্যক্ত জনহীন শহরের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াবে পরস্পরকে না–ছুঁয়ে। যে কোনো বাড়িতেই তাদের জন্য সুন্দর বিছানা পাতা থাকবে, দোকানে দোকানে সাজানো থাকবে জিনিস, তার একবার স্পর্শ করবে বলে গাছে গাছে ফুল ফুটে ফল ফলে থাকবে! তাদের দু'জনের উদ্দেশেই তখন রোদ বা বৃষ্টিপাত ঘটবে পৃথিবীতে।

না শ্যাম মাথা নাড়ে। পৃথিবীতে এরকম কিছুই ঘটে না। সে জানে। তাই পৃথিবী এখনো তেমন সুন্দর নয়। এখনো এখানে রয়ে গেছে কিছু অহঙ্কারী মোটর-সাইক্লিস্ট আর কিছু চোয়াড়ে লোক।

হোটেলে আজ মিত্রকে না দেখে সামান্য চমকে গেল শ্যাম। রোজ যে দেখা হয় তা নয়।

তবু আজ খেতে বসে বড় একা লাগল শ্যামের। সামনের উল্টোদিকের শূন্য চেয়ারটার দিকে চোরা চোখে চেয়ে দেখল অনেকবার। সামান্য সন্দেহে তার মন দুলে গেল। খাবারের তেমন কোনো স্পষ্ট স্বাদ পেল না শ্যাম। খেয়ে গেল।

হোটেলের ম্যানেজার লোকটার সঙ্গে কোনোদিনই প্রায় কথা বলে না শ্যাম। দরজার কাছে একটা ক্ষুদে টেবিল কোলে করে বসে থাকে বিনয়ী এবং মোটা থলথলে লোকটি দুটি ঢুলুঢুলু চোখ, দেখলে মনে হয়, সন্ধ্যের দিকে এক-আধ ছিলিম গাঁজা খায় ম্যানেজার। কথা কম বলে, হাসে অনেক বেশী কিন্তু শব্দ হয় না কখনো শ্যাম শোনেনি যে লোকটি ছোকরা চাকর কিংবা ঠাকুরকে চেঁচিয়ে বকছে। বস্তুতঃ বকাঝকা করার জন্যই আলাদা একজন লোক রাখা আছে-সে লোকটা চাকরদের ওপরওয়ালা। ম্যানেজার শুধু চুপ-চাপ বসে থাকে শান্তভাবে। শ্যাম লক্ষ্য করেছে, দিনে দিনে লোকটা আরো শান্ত হয়ে যাচ্ছে, নড়াচড়া কমে যাচ্ছে আরো। মুখের হাসিতে আরো বিনয় ও উদসীনতা ফুটে উঠছে মুখের কথা কমে গেছে অনেক। লোকটার মাথার ওপরে পিছনের দেয়ালে লোকটার মৃত বাবার একটা ছবি টাঙানো আছে, ছবির চারধারে একটা গত বছরের শুকানো বেলফুলের মালা। মাঝে মাঝে শ্যামের সন্দেহ হয় যে, হয়তো খুব শীগগীরই এ লোকটাও তার ছেলেকে ক্ষুদে টেবিলের কাছে নিজের পুরোনো জায়গাটা ছেড়ে দিয়ে একলাফে উঠে যাবে ওপরের দেয়ালে তার বাবার ছবির পাশে। তারপর ওরকমই একটা শুকনো বেলফুলের মালা পরে ছবি হয়ে যাবে একদিন, খুব শীগগীরই! নয়তো যেখানে বসে আছে সেখানেই বসে থেকে আস্তে আস্তে একদিন সিমেন্ট কংক্রিটের মতোই জমে যাবে লোকটা-ঠাণ্ডা পাথর হয়ে যাবে, আর নড়বেই না কোনোদিন!

আজ বেরোবার মুখে শ্যাম ক্ষুদে টেবিলটার সামনে একটু দাঁড়াল। বাইরের দিকে চেয়ে দেখল, কুকুর-অনেক কুকুর বসে আছে। রোজ যেমন থাকে। অকারণে শ্যাম মৃদু হেসে বলল-আঃ, কুকুর! তারপর এক দুই তিন করে গুনে গেল। এগারোটা।

-এত কুকুর! শ্যাম মৃদু হেসে শান্ত লোকটির দিকে তাকাল-এত কুকুরকে আপনি রোজ ভাত দেন?

-দিই। বড় বিনয়ে হাসল লোকটি। চোখ বুজে গেল হাসিতে।

-এগারোটা কুকুরকে? শ্যাম চোখ বড় করে তাকাল-আপনার খুব বেশী পুণ্য জমে যাচ্ছে! খুব তাড়াতাড়িই পুণ্য করে নিচ্ছেন আপনি, সময় থাকতেই!

বড় বিনয়ে লোকটি ঘাড় কাত করল, বলল-এগারোটার বেশী-কমও হয়।

হয়?

-হয়। লোকটা বিষণ্ন চোখে কুকুরগুলোর দিকে তাকাল, বলল-দিনে দিনে বাড়ছে। আরো বাড়বে।

-কেন?

-কেন! লোকটি চিন্তিত মুখে শ্যামের দিকে তাকাল-খাবার পাচ্ছে না কোথাও। দেশের যা অবস্থা, ক্রমে ক্রমে এখানে এসে জুটছে।

ঠিক। শ্যাম বিজ্ঞের মতে মাথা নাড়ে। বস্তুতঃ দেশের খাদ্যাবস্থা বহুকাল হয় শ্যামের আর জানা নেই। তবু লোকটার এত কথা বলা শুনতে তার ভাল লাগছিল।

-সব ক'টাই বাজে কুকুর নয়। লোকটা বলল-লক্ষ্য করে দেখুন, মাঝখানের সাদা কুকুরটা-ওই যে একটা ছাইরঙা দেখলে আর বোঝা যায় না, ওটা বোসদের কুকুর ছিল-অ্যালসেশিয়ান। গায়ে ঘা হয়ে পচে-টচে রাস্তার কুকুর হয়ে গেছে। বুঝলে মশাই, ওদের মধ্যেও-বলতে বলতে হাসল লোকটি একজন খদ্দেরকে এতক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখেছিল, তাকে পয়সা গুনে দিতে টেবিলের ওপরটা ডালার মতো তুলে ফেলল।

একটু অপেক্ষা করল শ্যাম, তারপর মুখ তুলতেই বলল-মিত্রকে দেখেননি আজ! সুবোধ মিত্রকে?

অমায়িক হাসল লোকটি; মাথা নাড়ল—না। এখনো আসেননি। বলে সস্নেহে কুকরগুলির দিকে চেয়ে রইল। শ্যাম লক্ষ্য করল, কুকুরগুলি বড় স্নেহে এবং ভালবাসায় শান্ত লোকটির দিকে চেয়ে আছে।

আর কথা না বলে বেরিয়ে এল শ্যাম। সে কুকুরগুলির ভিতর দিয়ে হেঁটে গেল, তারা একটু সরে পথ করে দিল। সন্দেহজনক শ্যানিয়েলটির দিকে একবার আদরের হাত বাড়িয়েও হাতটা টেনে নিল শ্যাম। তাতেই খুশী হয়ে কুকুরটা ল্যাজ নেড়ে দিল। ভিখিরি ব্যাটা—শ্যাম মনে মনে গাল দিল তাকে।

শ্যামের মাথার মধ্যে বিদ্যুতের মতো চমকে ওঠে একটা সন্দেহ। কাছেই সুবোধ মিত্রর বাসা। ইচ্ছে করলে একবার ঘুরে আসতে পারে শ্যাম। কিন্তু ইচ্ছে হয় না। যদি তেমন কোনো ঘটনাই ঘটে থাকে, তবে তার গিয়ে কী লাভ এবং এখন গেলে পুলিশ-টুলিশের ঝামেলায় জড়িয়ে পড়াই স্বাভাবিক। ভাবতেই ভয়ঙ্কর অলস লাগল শরীর। শ্যাম হাঁটতে হাঁটতে একটু দাঁড়াল। হাই তুলল। যদি ঘটনা ঘটেই থাকে তবে বলতেই হয় যে, মিত্র কথা রাখেনি। সতেরোটা ঘুমের বড়ির অর্ধেক বখরা শ্যামের পাওনা ছিল।

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল শ্যাম। তার ক'টা বড়ি পাওনা ছিল? হিসেব করলে ক'টা দাঁড়ায়! আটটা না নটা! অর্ধেক নেওয়ার কথা বলেছিল মিত্র, কিন্তু ঠিক ক'টা তা বলেনি। শ্যাম ভেবে দেখল, আর একজনকে দলে নিলেও ঠিক ঠিক তিন ভাগ করা যাচেছ না। ভাবতে ভাবতে বড় সমস্যায় পড়ে গেল শ্যাম। সে এই সিদ্ধান্তে পৌছোলো যে, ভাগ-বাঁটোয়ারার ক্ষেত্রে সতেরো সংখ্যা বিশ্রী। তারপর আবার হাঁটতে লাগল।

পৃথিবী অনেক নির্জন হয়ে গেছে। ক্রমে ক্রমে আরো যাবে। আস্তে আস্তে তার একার হয়ে যাবে সব কিছু। মিত্রকে দিয়ে শুরু হল হয়তো বা। কিংবা ঠিক তা নয়—আরো আগে থেকে—

তার মাথার ভিতরে অমনি বগরী পাখীর মতো গুর গুরু করে ডেকে উঠল একটি প্রায়-ভুলে-যাওয়া মোটর-সাইকেলের আওয়াজ। মৃত্যুকূপে সেই খেলার মতো ঘুরে ঘুরে উপরে উঠে আবার নীচে নেমে যেতে লাগল। শ্যাম দ্রুত হাঁটতে থাকে।

।। ১২ ।।

হয়তো একদিন পৃথিবীতে খুব সুসময় এসেছিল। তখন শ্যাম ছিল না। হয়তো একদিন পৃথিবীতে খুব সুসময় এসে যাবে। তখন শ্যাম থাকবে না। কেমন ছিল সেই সুসময় কে জানে! কিংবা কে জানে কেমন হবে সেই সুসময়! শ্যাম জানে না। মাঝে মাঝে কে কেবল তার চারধারে দেখতে পায় সেইসব সুসময়ের অনেক চিহ্ন ছড়ানো রয়েছে। যেমন পাখীর মুখ থেকে খসে পড়া ফসলের বীজ দেখে বোঝা যায় যে, কাছাকাছি এইখানে কোথাও ফসল ফলেছিল, যেমন আকাশের মেঘ দেখলে বোঝা যায় আমাদের বীজক্ষেত্রে বৃষ্টি হবে।

কিংবা কে জানে এইটাই সেই সবচেয়ে সুসময় কিনা যা শ্যাম পেরিয়ে যাচ্ছে!

দুপুর রৌদ মাথায় করে শ্যাম তার রোজকার পরিচিত থামটায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। এত আলোর মধ্যেও তার মনে হচ্ছিল যে, চারধারে ছায়ার মতো অলীক অনর্থক মানুষেরা অকাজে হেঁটে যাচ্ছে। সব কিছুই বস্তুতঃ অবাস্তব, একমাত্র সামনের ঐ কাচের দরজাটা ছাড়া। ওপাশে শীলা বসে আছে। ব্যস্ত কর্মঠ তার দুটি সাদা সুন্দর হাত, অল্প গম্ভীর ও বিষণ্ন তারণ্মুখ। শ্যাম জানে শীলা এখনো কোনো সিদ্ধান্তে আসেনি। এখনো বড় দয়ালু ওর মনে আঘাত করার আগে তাকে সতর্ক হওয়ার সময় দিচ্ছে। শ্যাম জানে, খুব শীগগীরই একদিন রাস্তার লোকেরাই তাকে ঘিরে ধরবে, চোখ পাকিয়ে তাকে সরে পড়তে বলবে। তবু যতদিন তা না ঘটবে ততদিনই বড় সুসময়। সবচেয়ে সুসময়।

তারপর একদিন হয়তো সে ইরফানের কাছে সোজা গিয়ে বলবে—আমি পাকিস্তানে চলে যাবো। আমাকে সীমানা পার করে দাও।

কিংবা সে হয়তো ঘুরে ঘুরে কষ্টে সৃষ্টে জোগাড় করার চেষ্টা করবে সতেরোটা ঘুমের বড়ি যা হাতে নিলে আত্মবিশ্বাস ফিরে পাওয়া যায়, বালিশের পাশে নিয়ে শুলে কেটে যায় ভয় কিংবা ভবিষ্যৎ চিন্তা।

কি করবে তা ঠিক জানে না শ্যাম। কেবল মনে হয়, এখনই হয়তো সবচেয়ে সুসময়।

আজও লীলা কাচের দরজার সামনে সে ছায়ার মতো দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। দ্বিধা কিংবা অপেক্ষা! তারপর শ্যামকে আপাদমস্তক চমকে দিয়ে দরজা খুলে লীলা রাস্তায় নেমে এল। একা। ধীর পায়ে হেঁটে যেতে লাগল।

প্রথমে কিছুক্ষণ এটা বিশ্বাস করল না শ্যাম। তারপর বুঝল মেয়েটা লীলাই, এবং সে একা হেঁটে যাচ্ছে। ধীর পায়ে।

নিঃশব্দে বেড়ালের মতো পায়ে, গোয়েন্দার মতো সন্ধানী চোখে লীলাকে রেখে, ভিড়ের ভিতরে লুকিয়ে থাকার চেষ্টা করে শ্যাম হাঁটে। হেঁটে যায়।

গাঢ় বাদামী জমির ওপর ফ্যাকাশে কলকা এবং আরো লাল জ্যামিতিক ছাপ দেওয়া একটা শাড়ি পরেছে লীলা, মোটা একটা বেণীতে বাঁধা তার চুল। পিছন থেকেও লীলাকে বড় পবিত্র দেখাচ্ছে। অলস মন্থরভাবে সে হাঁটছে, বাঁ হাতটা বুকের ওপর গোটানো বোধ হয়। সে তার সাদা ব্যাগটা বুকে চেপে ধরে আছে, গলায় জড়ানো কাশ্মীরী স্কার্ফের আঁচল উড়ছে হাওয়ায়।

রাস্তায় ভিড়, তবু ভিড়টাকে যথেষ্ট বলে মনে হয় না শ্যামের। তার এবং লীলার মধ্যে অনেকটা শূন্য জমি। লীলা ঘাড় ঘোরালেই চোখাচোখি হয়ে যেতে পারে। তার শূন্য বুকের ভিতরে লাফিয়ে ছুটছে হরিণ, শরীরের ভিতরে রহস্যময় মেঘ ডেকে ওঠে, বৃষ্টি নামে কালো একটা রেলগাড়ি খুব লম্বা একটা পুল পেরোতে থাকে। যদি চোখাচোখি হয়–যদি চোখাচোখি হয়ে যায়! যদি কথা বলে লীলা! যদি প্রশ্ন করে–তুমি কে?

ভাবতেই জড়িয়ে আসে শ্যামের হাত-পা। খালি রাস্তায় সে হোঁচট খায়। হাসে। আবার হাঁটে। তাহলে ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ ঘটে যাবে, অদৃশ্য থেকে নেমে আসবে এক ঢল জলের প্লাবন, হয়তো বা কথা বলে উঠবে রাস্তাঘাট! আর তখন নিশ্চিত নিজের পরিচয় ভুলে যাবে শ্যাম, লীলার সামনে দাঁড়িয়ে পাঠ ভুলে যাওয়া বাচ্চা ছেলের মতো ভীত চোখে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। বিড় বিড় করে বলবে–প্রশ্ন কোরো না আমি কে। আমি জানিনা।

সামনের মোড়ে রাস্তা পার হওয়ার অপেক্ষায় ভিড় জমে আছে। পুলিশের উত্তোলিত হাত চলন্ত গাড়িগুলো আটকে দিল। লীলা সামান্য থেমে আবার হাঁটে। রাস্তা পার হয়। ধীর মন্থর তার গতি–কোনোখানে যাওয়ার তাড়া বা লক্ষ্য নেই তার। চারধারে অর্থহীন অলীক ছায়ার মতো লোকজন। শ্যাম এদের কাউকেই চেনে না, জানে না এরা বাস্তবিক আছে, কিনা। এরাও কি তা জানে! শ্যাম এইসব ছায়া ভেদ করে হেঁটে যায়। বাস-স্টপ থেকে কারা যেন লীলাকে উদ্দেশ্য করে বলে–বাঃ–বেশ। অমনি গরগর করে ওঠে শ্যাম, অন্ধের মতো রুখে ঘুরে দাঁড়ায়, ফিস ফিস করে চাপা হিংস্র গলায় বলে–সাবধান! আমি পাহারায় আছি। হাসে। আবার হাঁটতে থাকে। নিজেকে বড় জীবন্ত মনে হয় তার। শরীরের ভিতরে কলকারখানা চলার আওয়াজ। সুসময় ...পৃথিবীতে এটাই বোধ হয় সবচেয়ে সুসময় যা শ্যাম পেরিয়ে যাচ্ছে।

লীলার গতি ক্রমে আরো মন্থর হয়ে আসে। সে অন্যমনে ফুটপাথের আরো ধার ঘেঁষে যায়, মুখ ফিরিয়ে শোকেসের জিনিস দেখতে দেখতে হাঁটে। হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ থেমে যায়, মনোযোগ দিয়ে কিছু একটা দেখে, তারপর পা পা করে হাঁটতে থাকে। লীলাকে যতটা অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে ততটা সে নয়–শ্যাম জানে। লীলার শরীর সতর্ক, কান উদ্‌গ্রীব, সে জানে যে, শ্যাম তার পিছনে আছে। খোলামেলা রাস্তায় একা অরক্ষিত লীলা। কে জানে লীলা তাকে নিঃশব্দে বলছে কিনা–কাছে এসো ভাল করে দেখতে দাও তোমার মুখ। তোমরা কি হিন্দু? তোমরা কী গোত্র? তোমার নাম পরিচয় আমাকে বলো। তোমার বাড়ি–ঘরদোরের অবস্থা আমাকে বলো। তোমরা ক'ভাইবোন? আর তোমার চাকরি.....?

এ সবকিছুই খুব জরুরী প্রশ্ন। লীলার জানা দরকার। শ্যাম তাই মনে মনে উত্তর দিয়ে দেয়--শ্যাম চক্রবর্তী আমার নাম, বাবা কমলাক্ষ চক্রবর্তী আমরা শান্ডিল্য গোত্র, বিক্রমপুরের বানিপাড়া গ্রামে আমাদের বাড়ি....না.... সেইন্ট অ্যাণ্ড মিলারে আমি ছিলুম ছোটোসাহেব, ওপারওয়ালা বাসটার্ড বলে গাল দেওয়ায় আমি চাকরি ছেড়ে দিয়েছিলুম...তবু সত্যি বলতে কি আমি জানি না আমি কে কিংবা আমি কি রকম.....

লীলা আস্তে আস্তে হাঁটে যে কোনো দোকানের সামনে একটু দাঁড়ায়, শোকেস দেখে নেয়, আবার হেঁটে যায়। সাহসী লোকেরা তার কাছ ঘেঁষে হেঁটে যাচ্ছে।

ক্রমে লিণ্ডসে স্ট্রীটের কাছে চলে এল তারা। রাস্তা ক্রমে ফাঁকা হয়ে আসছে। রাস্তা পার হওয়ার আগে লীলা একবার ফিরে তাকায় অন্যমনে। অবহেলার চোখ-তাচ্ছিল্য ফুটে আছে। পরমুহূর্তেই চোখ সরিয়ে নেয়। তবু বঁড়শির মতো সেই দুটি চোখ শ্যামের বুকের মধ্যে গেঁথে যায়। তার শরীর যন্ত্রণায় ছটফট করে ওঠে। বুকের মধ্যে হঠাৎ জলোচ্ছ্বাস ফুলে ফেঁপে ওঠে। তার শ্বাসকষ্ট হতে থাকে।

নিঃশব্দে লীলা বলে ওঠে-কাছে এসো।

শ্যাম আপনমনে মাথা নাড়ে। না আমি জানি কাছে যেতে চেষ্টা করলে চারদিকের বাড়িঘর কেঁপে উঠবে, মাঠ ময়দান থেকে শিকড় ছিঁড়ে ছুটে আসবে গাছপালা, বাতাস আর্তস্বরে চেঁচিয়ে বলবে-রক্ষা করো, রক্ষা করো; আমি জানি, এখানে নয়, অন্য কোনো সুন্দর পৃথিবীতে আমাদের দেখা হওয়া ভাল। এখানে নয়-এত লোকজন আর এত ভিড়ের মধ্যে নয়। দেখো একদিন খুব শীগগীরই আমি পৃথিবীতে সুসময় এনে দেবো।

সে লীলার নিঃশব্দ স্বর শুনতে পায়-কথা বলো।

না। মাথা নাড়ে শ্যাম। এখনো নয়। তোমার সঙ্গে কথা বলার জন্যই আমি আলাদা একটা ভাষা তৈরী করবো দেখো। সেই ভাষায় থাকবে না কোনো কঠিন, রূঢ় কিংবা অশ্লীল শব্দ, তাতে থাকবে না কোনো গালাগাল। এখনো মানুষের ভাষা তেমন সুন্দর নয়। এখনো তাদের জানা বহু শব্দ রয়ে গেছে-যা রহস্যময়, কিংবা যা রাগ ও বিদ্বেষের, যা অবহেলা কিংবা প্রত্যাখ্যানের। আগে তুমি সেই সব শব্দ ভুলে যাও, তারপর.....

লীলা রাস্তা পার হল না। বাঁয়ে মোড় ঘুরল। কয়েক পা হেঁটে একটা খোলা দরজার সামনে দাঁড়াল হঠাৎ। পিছনে ফিরে অন্যমনস্ক চোখে একবার চারদিকে দেখে নিল। তারপর দরজার ভিতরে চলে গেল।

শ্যাম ধীরে ধীরে দরজাটার সামনে এসে দাঁড়ায়। ভিতরে কেবল দেখা যাচ্ছে একটা সরু সিঁড়ি-স্টীমারের সিঁড়ির মতো সুন্দর, লোহার চকচকে পাতকে বসানো, মসৃণ রেলিঙ, খুব উজ্জ্বল আলো জ্বলছে। সিঁড়িতে লীলা নেই। উঠে গেছে। নতুন রঙের গন্ধ পাওয়া যায়, আর মৃদু, খুব মৃদু পাউডারের গন্ধ।

এটা কি রেস্তোরাঁ! শ্যাম কয়েক পা পিছিয়ে এসে দরজার ওপরে দেখল রেস্তোরাঁ। সাইন বোর্ডে নাম লেখা আছে। শ্যাম জানে এখানে লীলার জন্য কেউ অপেক্ষা করছে। শ্যামের জানা দরকার লোকটা কে! সে আশেপাশে তাকিয়ে দেখল কোনো মোটর-সাইকেল দাঁড় করানো আছে কিনা। নেই।

কোনো দ্বিধাই বোধ করল না শ্যাম। আস্তে আস্তে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে লাগল।

হলঘরের মতো প্রকাণ্ড একটা ঘর। এত উজ্জ্বল আলো জ্বলছে যে শ্যামের চোখ ধাঁধিয়ে যায়। পেয়ালা পিরিচ, চামচ কিংবা টেবিলের কাচের চাদর থেকে ঠিকরে এসে আলো তার চোখে আলপিনের মতো বেঁধে। কিছুক্ষণ সে ভাল করে লীলাকে দেখতে পেল না। সে তার রুক্ষ চেহারা এবং এলোমেলো পোশাকে এই ঝকঝকে ঘরে বেমানান কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল।

তারপর লীলাকে দেখতে পেল সে। প্রায় ফাঁকা রেস্তোরাঁ। কয়েকটিই মাত্র লোক ছড়িয়ে বসেছে, একেবারে কোনো দূরের টেবিলে বসেছে লীলা, টেবিলের ওপর অল্প নোয়ানো কাঁধ, মুখ

নীচু যেন টেবিলের কাছে সে তার মুখের ছায়া দেখছে। না, লীলা একা নয়,তার মুখোমুখি উল্টোদিকের চেয়ারে বসে আছে সুন্দর চেহারার একটি লোক।

অরুণ না! ভ্রু কুঁচকে শ্যাম দেখে, তারপরে মৃদু হাসে। হ্যাঁ, অরুণই।

অরুণ তাকে প্রথম দেখতে পেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে চোখ দুটো লাফিয়ে উঠল অরুণের, কপালে পড়ল ভাঁজ। মুখ সামান্য ফাঁক হয়ে রইল একটুক্ষণ। শ্যাম বুঝল না, কেন এরকম হল অরুণের! সে মৃদু হাসিমুখে চেয়ে রইল অরুণের দিকে।

সামান্য ফিসফিস করে অরুণ বলল—শ্যাম! অনেকক্ষণ পর হাসল—আয়! আশ্চর্য যে, লীলা তার দিকে ফিরেও তাকাল না।

অরুণের ডাকটাকে গ্রাহ্য করল না শ্যাম। মাঝখানের তিনটে টেবিল সে বাদ দিয়ে বসল। একা। এক কাপ চায়ের কথা বলে দিল বুড়ো বেয়ারাকে।

আড়চোখে সব কিছু লক্ষ্য করে শ্যাম। অরুণের মুখ অল্প লাল। তাকে লাজুক আর ভীতু দেখাচ্ছে। খুবই আশ্চর্য হল শ্যাম। এরকম হওয়ার কথা ছিল না। তার নিজের অতীতের মতোই অরুণের চরিত্র—সে জানে। কোনো লোকের বদলে অরুণকে দেখে শ্যাম বরং স্বস্তি পায়। শ্যাম জানে যে, সে যতক্ষণ আছে ততক্ষণ অরুণের কাছে থেকে লীলার কোনো ভয় নেই। শ্যাম নিজে অরুণের চেয়ে অনেক পাকা লোক ছিল।

সে লক্ষ্য করল, অরুণ কথা বলছে না লীলার সঙ্গে। সে কাঁটা চামচ দিয়ে এক টুকরো আলুর বড়া মুখে পুরে ভয়ঙ্কর জোরে উত্তেজিত ভাবে চিবোচ্ছে। ঝনন করে তার চামচ পিরিচের সঙ্গে ঠুকে সামনের দেয়ালে ঘুরে বেড়ায়। সুন্দর চেহারা আর সুন্দর পোশাক অরুণের ওই ভাবভঙ্গী খুব বেমানান লাগে শ্যামের কাছে।

লীলা খুব ঠাণ্ডা এবং সহজ ভঙ্গীতে বসেছে এখন। নোয়ানো মাথা তুলে অরুণের দিকে চেয়ে দেখছে। তার মুখে একটু স্মিত কৌতুকের ভাব। হঠাৎ সে তার একটু তীক্ষ্ণ পাখীর মতো মিষ্টি গলায় স্বাভাবিকের চেয়ে একটু জোরে বলল—আপনি আমাকে ডেকেছিলেন!

অরুণ সামান্য অস্থির অস্বস্থির হাসি হাসে, মাথা নাড়ে—হ্যাঁ।

—আমি এসেছি।

খুব মৃদু গলায় অরুণ কিছু বলল। শ্যাম শুনতে পেল না। শুধু দেখল, অরুণের কথার উত্তরে লীলা শুধু মাথা নেড়ে জানাল—না।

লীলাকে কেন এখানে ডেকে এনেছে অরুণ তা শ্যাম বোঝে। তবু লীলাকে খুব শান্ত ও দৃঢ় দেখায়—যেন লীলার সঙ্গে আছে কোনো সমর্থ লোক যে লীলাকে আপদে রক্ষা করবে। লীলার চোখেমুখে সেই প্রত্যয় দেখে শ্যাম। লক্ষ্য করে, অরুণ তার শুকনো ঠোঁট চাটছে, এবং বোকার মতো এড়িয়ে যাচ্ছে শ্যামের চোখ। শ্যাম মৃদু হাসে। তার সামনের টেবিলে রাখা এক কাপ চা আস্তে আস্তে জুড়িয়ে যেতে থাকে।

ওরা আর কথা বলে না। চুপচাপ বসে থাকে। লীলার সামনে রাখা খাবারের প্লেট পড়ে থাকে। শ্যাম একটু বিস্মিত হয়—লীলা কি জানে না যে, শ্যাম তার খুব কাছেই বসে আছে!

লীলা জানে। একটু পরেই শ্যাম সেটা টের পায়।

বাঁ হাতে জলের গ্লাস ধরে ডান হাতে লীলা তার বেণীটা বুকের ওপর টেনে আনে। ঐ ভাবে কৌশলে ঘাড় কাত করে অরুণের অজান্তে লীলা হঠাৎ সোজা শ্যামের দিকে তাকায়। যেন লীলা একবারও ঘাড় না ঘুরিয়েই জানত শ্যাম কোথায় বসে আছে। তার চোখের ওপর লীলার চোখ ঝলমল করে ওঠে। আর সেই মুহূর্ত খুব চমকে উঠে শ্যাম দেখতে পায়, লীলা একটু হেসেই হাসিটা ঠোঁটে টিপে দিল, তার চোখ আঙুলের মতো একটু সংকেত করে দেখিয়ে দিল অরুণকে। নিঃশব্দে কয়েক পলকে এইসব অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেল। তারপরই স্বাভাবিকভাবে মুখ ফিরিয়ে নিল লীলা।

আস্তে আস্তে বুঝতে পারে শ্যাম। বুঝতে পারে আজ বিকেলে ইচ্ছে করে কেন একা ধীরে ধীরে এতদূর হেঁটে এল লীলা। লীলা জানত শ্যাম তার পিছু নেবে। তাই খুব এতদূর কৌশলে তাকে টেনে এনেছে লীলা। লীলা ঘাড় না ঘুরিয়েও জানতে যে সে খুব কাছেই বসে আছে। লীলা

জানে যে, যে কোনো আপদে-বিপদে শ্যাম তাকে রক্ষা করবে। তাই সে কৌশলে শ্যামকে বলে দিল-এই লোকটার হাত থেকে আমাকে বাঁচাও।

নিজের ভিতরে শীতল এক নিষ্ঠুরতা অনুভব করে শ্যাম। দুটি মুষ্টিবদ্ধ হাতের মতো শক্ত হয়ে যায় তার চোয়াল। সে অরুণের দিকে চেয়ে থাকে। তার রক্তে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতে থাকে। আর একটিমাত্র ইঙ্গিতের জন্য তার সমস্ত শরীর প্রস্তুত থাকে।

মৃদু স্বরে কথা বলে অরুণ। বিরক্তিতে মাথা ঝাঁকায় লীলা। না। না, না। তারপর কিছুক্ষণ চলে। শান্তভাবে বসে থাকে শ্যাম। অপেক্ষা করে। তার মাথার ভিতরে ধীরে ধীরে আর সব বোধ লুপ্ত হয়ে যায়, শুধু কুয়াশার মতো জমে ওঠে রাগ।

শ্যাম দেখে, অরুণ বিল মিটিয়ে দিচ্ছে। টেবিলের ওপর থেকে সাদা হাতব্যাগ তুলে নিচ্ছে লীলা। ওরা উঠে দাঁড়াল। ওরা হেঁটে এল, সামনে লীলা। একবার-সেটাও ভুল হতে পারে-মাত্র একবার শ্যামের মনে হল, লীলার চোখ তার টেবিলের একটা কোণ ছুঁয়ে গেল।

অরুণ তার দিকে চেয়ে হাসল। সে হাসিতে কোনো ইচ্ছা-বা প্রাণ নেই। সেই উঁচু ফিসফিস স্বরে বলল-শ্যাম! একটু দ্বিধায় দাঁড়াল, বলল-পরে কথা হবে।

লীলা ফিরে তাকাল না। তার দরকারও নেই। শ্যাম বোঝে।

সিঁড়ির চৌপুরীতে ওরা নেমে গেলে উঠে দাঁড়াল শ্যাম। তাড়াতাড়ি একটা ট্রে হাতে ছুটে এল বুড়ো বেয়ারা। বিরক্তিকর ভাবে পথ আটকাল। পকেটে হাত দিয়ে খুচরো পয়সা যতখানি হাতে পেল, তুলে এনে ঝনাৎ করে তার ট্রে-তে ফেলে দিল শ্যাম। তারপর আর ফিরেও তাকাল না।

নিচে নেমে এসে দেখল কোথাও কেউ নেই, তাড়াহুড়ো করে ওদের খুঁজল না শ্যাম। ধীরে ধীরে হেঁটে এসে নিশ্চিত মনে বাস ধরল।

হোটেলে ঢুকে ভূত দেখে আঁতকে উঠল শ্যাম। সুবোধ মিত্র। অনেককালের পুরনো বন্ধুর মতো হাসল মিত্র।

--কাল আসেননি। শ্যাম জিজ্ঞেস করে।

-না। মিত্র মাথা নাড়ে-কাল একটা বরযাত্রী গিয়েছিলুম।

-শ্যাম উল্টোদিকে মুখোমুখি বসে।

মিত্র বলল-কাল একটা আশ্চর্য ব্যাপার দেখলুম মশাই। বরযাত্রী গিয়েছিলুম পুটিয়ারি পশ্চিম না দক্ষিণ ঠিক মনে নেই, টালিগঞ্জের খাল পেরিয়ে যেতে হয়। ও-সব গ্রাম-গঞ্জ কিছুকাল আগেও। কিন্তু গিয়ে শুনলুম ওটাও নাকি কলকাতা....হাঃ হাঃ দু'দিন পরে আপনি যেদিকেই যাবেন, যতদূর যাবেন, দেখবেন কলকাতা আর কলকাতা.. কলকাতার শেষ নেই আর... লাফিয়ে লাফিয়ে শহর বেড়ে যাচ্ছে মশাই, গ্রাম-গঞ্জ ক্ষেত-খামার যা পাচ্ছে হাতের কাছে তাতেই স্ট্যাম্প মেরে দিচ্ছে-ক্যালকাট্টা!... হাঃ হাঃ ...বাড়তে বাড়তে একদিন এই কলকাতাই না দুনিয়াময় হয়ে যায়! ...হাঃ হাঃ.... এতকাল কলকাতার মাঝখানে থেকে টেরও পাইনি যে, কলকাতা কেমন বেড়ে যাচ্ছে চারিদিকে! এরপর আর কলকাতার বাইরে যাওয়ার চেষ্টা করলেও যাওয়া যাবে না মশাই, খুব অদ্ভুত ব্যাপার হবে, দেখবেন! তখন পাহাড়ে যাবেন তাও কলকাতায়, সমুদ্রে যাবেন তাও কলকাতায়; তখন কলকাতায় জন্মে সারাজীবন কলকাতাতেই ঘুরে মরবে লোক .....হাঃ হাঃ....

খাওয়া হয়ে গেলে এক সঙ্গে বেরোলো দু'জন। শ্যাম শুনে দেখল আজ পনেরোটা কুকুর। সে হঠাৎ বলল-কুকুর খুব বেড়ে যাচ্ছে, দেখেছেন!

-হ্যাঁ । মাথা নাড়ে মিত্র। হেসে বলে-আমাদের ম্যানেজার লোকটা খুব কুকুরভক্ত। তারপর একটু গলা নামিয়ে বলল-বোধ হয় রোজ মহাভারত পড়ে.... হাঃ..হাঃ...

মিত্রকে গড়িয়াহাটায় দিয়ে ঘরের দিকে ফিরল শ্যাম। দূর থেকেই দেখল বাসার সামনে রাস্তার ফুটপাথে অরুণ দাঁড়িয়ে আছে। তার টাইয়ের 'নট ঢিলে হয়ে গেছে, রাস্তার মৃদু আলোতে তার মুখটা লাল আর চোখ দুটো হতভম্ব দেখায়।

-ওঃ শ্যাম! অরুণ সামান্য টলমলে পায়ে এগিয়ে আসে, একটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে বোকা-হাসি হাসে-তোর সঙ্গে কথা আছে.....

শ্যাম তার হাত ছোঁয় না, দাঁড়িয়ে স্থির চোখে তাকে দেখে। নিজের ভিতরে শীতল এক নিষ্ঠুরতাকে অনুভব করে সে। ঠাণ্ডা গলায় বলে-আয়।

হুইস্কির চেনা গন্ধ পায় শ্যাম। সামান্য অস্থির পায়ে অরুণ তার পিছনে হেঁটে আসে। আসতে আসতে কথা বলে–ওঃ, শ্যাম, আমার বড় কষ্ট রে। আমি আর পারছি না রে

হুইস্কির চেনা গন্ধ–বহু দুর অতীত থেকে ঐ গন্ধ ভেসে আসছে। স্থান ভুলে গেছে শ্যাম। ভাবতে ভাবতে সে সিঁড়ি ভাঙ্গে। পিছনে অরুণ।

ঘরে ঢুকে অরুণ হাঁফায় বিছানায় বসে পড়ে, তারপর বালিশ টেনে নিয়ে আধশোয়া হয়। তার স্যুটের ভাঁজ নষ্ট হচ্ছে, সেদিকে তবু খেয়াল করে না অরুণ। বলে–তুই দেখছিস্। তুই সব দেখে বুঝে নিয়েছিস শালা.. তোকে আমি.... বলতে বলতে আবার দৃষ্টি শূন্য হয়ে যায় অরুণের। হতভম্বের মতো তাকিয়ে থাকে।

শ্যাম তার চেয়ার জানালার কাছে টেনে আনে, তার ওপর একখানা পা তুলে দিয়ে দাঁড়ায়। অরুণকে দেখে।

কী বলছিল তা ভুলে গিয়ে অরুণ বলল–ওঃ তোকে আমার শ্বশুরের কাছে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল, না? তোর হয়ে শ্যাম, তুই ভাবিস না। আমি বাইরে যাওয়ার আগে তোকে বসিয়ে দিয়ে যাবো। বোকার মতো অর্থহীন হাসি হাসে অরুণ-আমি অনেক কিছু পারি, জানিস! আমি শালা অনেক কিছু ধীরে...ধীরে চোখ বোজে অরুণ। বমি করার আগের মুহূর্তের মতো শরীর কেঁপে ওঠে তার, চোখ ঠিকরে ওঠে, মুখ লাল। আবার সামনে যায় অরুণ। হাঁফায়। বলে–তবু কী বলবো, ঐ বুড়োটাকে আমি ভয় পাই, ওই শালা বুড়ো আমার সব কিছু হাতের মুঠোয় নিয়ে বসে আছে, ইচ্ছে করলে ও আমায় বাঁদরনাচ নাচাতে পারে, শালা হারামির বাচ্চা..... বলতে বলতে আবার বমির ভাব সামলে নেয় অরুণ–আমার পিছনে লোক লাগিয়েছে শালা, শাসিয়েছে দরকার হলে আমাকে গুন্ডা দিয়ে মারবে.....

–কে! শ্যাম ঠাণ্ডা গলায় প্রশ্ন করে।

–আমার বউয়ের বাপ। শালা শ্বশুর...শালা একটা সুন্দর মেয়ের জন্ম দিতে পারেনি মাইরি, তবু শালা শ্বশুর ! আমার শ্বশুর!.... তুই ভাবতে পারবি না শ্যাম, আমার বউটা কী কুচ্ছিত, ঘর অন্ধকার করে দেওয়ার চেহারা!... তবু আমাকে ইন্ টাইম ঘরে ফিরতে হবে শালা, না হলে আমি চরিত্রহীন!.... আমার বউটাকে যদি তুই দেখতিস শ্যাম! ও যদি অ্যাডলটারি করতে চায় শেয়ালেও ছোঁবে না ওকে... বলতে বলতে বিছানা থেকে মুখ বের করে মাথা নামায় অরুণ। সমস্ত শরীরে হেঁচকি তোলার মত কাঁপুনি। শ্যাম লক্ষ্য করে, ঘোষা জলের স্রোত অরুণের মুখ থেকে কলের জলের মতো ধারায় নেমে এসে ভাসিয়ে দিচ্ছে তার ঘরের মেঝে। মুহূর্তেই হুইস্কি আর টক বমি গন্ধে ঘর ভরে যায়। বিষিয়ে ওঠে বাতাস। শ্যাম তবু একটুও নড়ে না। পাথরের চাঙরের মতো স্থির দাঁড়িয়ে থেকে অরুণকে লক্ষ্য করে।

ধীরে ধীরে মুখ তোলে অরুণ। কোনো দ্বিধা না করে শ্যামের বালিশ থেকে ময়লা তোয়ালেটা তুলে নিয়ে মুখ মুছে, আবার সেটা বালিশে পেতে দেওয়ার চেষ্টা করে। তারপর অধৈর্য ক্লান্ত একটা হাত বাড়িয়ে বলে–সিগরেট!

শ্যাম তার সস্তা সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই বিছানায় ছুঁড়ে দেয়। অনেক কষ্টে সিগারেট ধরায় অরুণ, আগুনের ফুলকি ঠিকরে পড়ে বিছানায়।

–আমার শরীরে শালা চিতাবাঘ ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু তবু শালা আমাকে ইন্ টাইম ঘরে ফিরতে হবে, তারপর ওই কুচ্ছিত বউটা..মাইরি, একটু লাবণ্য নেই, ডায়েট কন্ট্রোল না করেও এমন হাড়গিলে... ওঃ অ্যামেরিকা.....

বালিশে মাথা গুঁজে দেয় অরুণ। কিছুক্ষণ যেন স্বপ্নের ঘোরে একটু হাসে। তারপর ধীরে ধীরে মাথা তোলে আবার। অপরিচিতের চোখে শ্যামের দিকে ভ্রূ কুঁচকে তাকায়–শ্যাম!

তারপর কথা ভুলে গিয়ে আবার হতভম্বের মতো তাকিয়ে থাকে।

–তুই জানিস না শ্যাম, আমার পিছনে লোক লেগে আছে। কিছুতেই সেই লোককে ধরতে পারছি না। আমার সব খবর সে দিয়ে দিচ্ছে শালা বুড়োকে। আমি রেস্তোরাঁর পর রেস্তোরাঁ পাল-টাচ্ছি, কত গলিঘুঁজিতে চলে যাচ্ছি মেয়েছেলে নিয়ে, কত অচেনা জায়গায় যাচ্ছি, কিন্তু কিছুতেই পালাতে পারছি না, লুকিয়ে থাকতে পারছি না। বুড়ো আমাকে দাঁড় করিয়ে আমার সারাদিনের সব গোপন রিপোর্ট আমাকেই শুনিয়ে দিচ্ছে।...মাইরি, তারপর চাকরবাকরের মতো ট্রিট্ করছে, বাচ্চা ছেলের মতো ধমকাচ্ছে...। কী করে খবর পাচ্ছে..

তারপর হঠাৎ হাসে অরুণ–দাঁড়া শালা, একবারই আমি শালা পালাবো, ভিসাটা হাতে পাই, তারপর জোট্ইওর ওয়ে টু অ্যামেরিকা... ভোঁ-ওঁ-ওঁ-ওঁ-ওঁ..

যে হাতে এরোপ্লেনের ভঙ্গী করে দেখাল অরুণ, সেইহাতটাই হঠাৎ মুঠো পাকিয়ে চাপা গলায় বলল–কিন্তু কে খবর দিচ্ছে! আমি শালা কিছুতেই ধরতে পারছি না, কে!... রাস্তায় হাঁটি রেস্তোরাঁয় বসি, বারে যাই, কিন্তু সব সময়ে আমার ঘাড় সুড় সুড় করে, পিঠের চামড়ায় যেন কার চোখ টের পাই। সব সময়ে ভয়-ভয়, চিন্তা টেনশন! কে খবর দিচ্ছে! কে!

বাতাসে শূন্য চোখে চেয়ে অরুণ জিজ্ঞেস করে-কে! তারপর আবার ককিয়ে ওঠে–তুই জানিস না শ্যাম অ্যামেরিকা যাওয়ার মাঝপথ থেকে ওই বুড়ো আমাকে ফিরিয়ে আনতে পারে। ইচ্ছে করলে তছনছ করে দিতে পারে আমার ক্যারিয়ার, যখন খুশী ভয় দেখাতে পারে আমাকে... মেয়ের নামে তিনটে বাড়ি দিয়েছে শালা,দুলাখ টাকা। আমি শালা বড়লোক। কিন্তু সব কেড়েকুড়ে নিতে পারে আবার। ইচ্ছে করলে..ইচ্ছে করলে আমাকে হাওয়া করে দিতে পারে....অথচ আমার শরীরে চিতাভাগ ঘুরে বেড়াচ্ছে, একটা সুন্দর মেয়ের জন্য... একটা সুন্দর কিছুর জন্য.....আমি শালা....

আস্তে আস্তে চোখের জল ঝরে পড়ে অরুণের। কোনো শব্দ হয় না, শুধু ঠোঁট দুটো কাঁপে। শ্যাম স্থির দাঁড়িয়ে দেখে। আস্তে আস্তে শ্যামের দিকে তাকায় অরুণ, ফোঁপানো গলায় বলে–তুই আজ আমাকে দেখছিস!

শ্যাম মাথা নাড়ে। হ্যাঁ।

অরুণ বলে–তোকে দেখে আমি চমকে গিয়েছিলুম। বলে অস্বস্থির হাসি হাসল–অনেকদিন তোর খোঁজ–খবর রাখিনি, জানি না সত্যিই এখন কী করছিস। সেদিন তোর সঙ্গে দেখা হলে অনেক কথা বলে দিয়েছিলুম। আজ তাই হঠাৎ তোকে দেখে কেমন যেন মনে হল তুই–ই আমার শ্বশুরের সেই লোক। বলে হাসে অরুণ-তোকে পাকা মস্তানের মতো দেখাচ্ছিল।

উত্তর দেয় না শ্যাম। স্থির দাঁড়িয়ে অরুণকে দেখে।

আস্তে আস্তে অরুণের মুখ থেকে হাসি সরে যায়। ভিখিরির মতো গলায় সে বলে–আমি তোর জন্য সব করবো শ্যাম। আমি অনেক কিছু পারি। আমি শালা পালাতে চাই। একবার যেতে পারলে আমি আর ফিরবো না। ....ওই কুচ্ছিত বউ, ওই হারামী বুড়ো আর এই ভিখিরির দেশ ছেড়ে পালাতে পারলে শালা... আবার আমি বড়লোক হয়ে যাবো। বলে অসহায়ভাবে চারদিকে তাকায় অরুণ, জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটে–আমার এখনো সব শেষ হয়ে যায়নি। এখনো আমার বয়স আছে... কিন্তু সব গোলমাল হয়ে যাবে শ্যাম, যদি তুই একবার ফোন তুলে বুড়োকে বলে দিস যে, আমি আজ লীলার সঙ্গে ছিলুম বিকেলে...

হঠাৎ আবার শ্যামের বুকের মধ্যে গুর গুর করে মেঘ ডেকে ওঠে, চমকে ওঠে বিদ্যুৎ। হরিণ দৌড়োয়। আর কালো রেলগাড়ি লম্বা একটা রেল পুল পেরিয়ে যেতে থাকে।

ধীর শান্ত গলায় সে প্রশ্ন করে–তুই লীলাকে কখনো ছুঁয়েছিস?

–আঁ! বলে অরুণ অর্থহীন চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর দুঃখে মাথা নাড়ে–না। তারপর বদমাসের মতো হাসে–সী ইজ ইন লাভ। তোর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো বলেছিলুম না? করবি আলাপ?

শ্যাম আবার বলে–আজ বিকেলে কী কী হয়েছিল?

–নাথিং। হাসে অরুণ–আমরা ভাইবোনের মতো ছিলুম। বলে বড় করে শ্বাস ছাড়ে অরুণ–আজই প্রথম অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল। বললুম, ট্যাক্সিতে ঘুরে বেড়াই চল। বলল, না। জিজ্ঞেস করলুম, রাত্রে একা একা লাগে না? ভীষণ রেগে গেল–বলতে বলতে অরুণ হেঁচকি তুলে হেসে উঠল– আসলে মেয়েটা একেবারে বাচ্চা, আর নতুন। তার ওপর বোধ হয় এনগেজড্। তবু আমি আম্বিকা হালদারের জামাই, আমাকে এড়াতে পারে না বলে এসেছিল–বলতে বলতে সামান্য অহঙ্কারী হয়ে গেল অরুণের মুখচোখ! হেসে বলল–দূর শালা, এর চেয়ে মিস্ দত্ত অনেক হট্ ছিল। কী বাটক্ মাইরি...

আস্তে আস্তে উঠে মেঝেতে নিজের বমির ওপর দাঁড়াল অরুণ। বলল–শ্যাম, আমার দিব্যি মাইরি, বুড়ো যদি জানতে পারে.. তোর শালা চোখ বটে! কী করে খুঁজে খুঁজে ঐ রেস্তোরাঁয় বের করলি আমাকে? নাকি শালা তুই সারাদিন আমার পিছনে লেগেছিলি! অ্যাঁ?

শ্যাম চুপচাপ চেয়ে থাকে। না, তাকে আর কিছুই করতে হবে না। সে বুঝে যায় অরুণকে কষ্ট দেওয়ার ভার অরুণই নিয়েছে।

অরুণ তার বমির ওপর একবার পা হড়কায়, সামলে নিয়ে আস্তে আস্তে দরজার কাছে চলে যায়। হাত তোলে। হেসে বলে–টু অ্যামেরিকা.....! চলে যায়। দরজা পর্যন্ত মেঝেতে তার বমিতে ভেজা পায়ের ছাপ পড়ে থাকে।

শ্যাম জানালা দিয়ে দেখে অরুণ রাস্তার ধারে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে একখানা হাত শূন্যে তুলে অদৃশ্য ট্যাক্সি থামানোর চেষ্টা করছে।

সে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। অরুণ ঠিক পৌঁছে যাবে–শ্যাম জানে। কাল সকালে আজকের কথা মনে থাকবে না অরুণের। প্রতিদিনই ওইভাবে আগে দিনের কথা ভুলে যেতে যেতে ঠিকঠাক মতোই নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে যাবে অরুণ। ঘরের মেঝের দিকে চেয়ে অর্থহীন হাসল শ্যাম।

অনেকদিন পর তার ইচ্ছে করল ঘরটাকে একটু সাজায়।

।। ১৩ ।।

হ্যাঁ। আজকের কাগজে খবরটা আছে। ঠিক বোঝা যায় না, তবু বোধ হয় এটাই সেই খবর।

প্রথমে কিছুক্ষণ নিজের চোখ, বোধশক্তি এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে বিশ্বাস হয় না শ্যামের। তারপর আস্তে আস্তে সে বুঝতে পারে ঘটনাটা বোধ হয় ঘটে গেছে। সত্যিই। কিছুকাল আগে দক্ষিণ কলকাতায় এক মোটর-সাইকেল দুর্ঘটনায় আহত শ্রীগৌর ভৌমিক (৩২) গতকাল দুপুরবেলা শৃকলাল কারনানি হাসপাতালে মারা গেছে। দুর্ঘটনার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তার জ্ঞান ছিল না। মৃত্যুর দু' বছর আগে তার বিয়ে হয়েছিল এবং তার একটি শিশুকন্যা আছে। আছে বাবা মা এবং তিন ভাইবোন। লোকটা খুব অখ্যাত ছিল না, রেডিওতে গান গাইত এবং তার দুটি রেকর্ডও আছে। যদিও গান শোনেনি শ্যাম এবং লোকটার নামও তার জানা ছিল না।

এই সেই লোক কি না কে জানে! শ্যাম জানে না। আস্তে আস্তে খবরের কাগজটা সে মাটিতে রেখে দিল। জানালার কাছে দাঁড়িয়ে সে একটা সিগারেট ধরায়। আজও সেই রকম রোদ, অবিকল তেইশে ডিসেম্বরের মতো। ওই সেই রাস্তার তেমাথার বাঁক। লোকটা ডানদিকে মোড় ঘুরতে গিয়ে কৃষ্ণচূড়া গাছটার তলায় আছড়ে পড়েছিল। গৌর ভৌমিক! গান গাইত! একটা শিশু মেয়ে আছে তার! আছে বউ! আছে বাবা মা ভাইবোন! আশ্চর্য, এত সম্পর্কের মধ্যে বাঁধা ছিল লোকটা! অথচ শ্যাম টেরও পায়নি। সে শুধু দেখেছিল একটা মোটর–সাইকেলের কালো ভোঁতা মুখ, আর অচেনা একটা মানুষের ছুটন্ত শরীর। কে জানত যে লোকটার অত পরিচয় আছে!

তবু এই সেই লোক কিনা কে জানে! শ্যাম জানে না। যদি এই সেই লোক হয়ে থাকে তবে শ্যাম এ জন্মের মতো বেঁচে গেল। কোনোদিনই অকারণে আয়নার আলো ফেলার জন্য কেউ তাকে দায়ী করবে না। সমস্ত প্রমাণ লোপ পেল, গোপন রইল কারণ, শুধু জানা গেল যে লোকটা মারা গেছে।

অনেকদিন হয় আর আয়না দেখেনি শ্যাম। তাকের ওপর থেকে আয়নাটা তুলে নিতে গিয়ে দেখল অনেক ধুলো জমে আছে। নিজের আবছা অলীক এক মুখচ্ছবির দিকে সে একটু তাকিয়ে রইল। বলল–আমি নই। তারপর মাথা নেড়ে নিজের প্রতিচ্ছবিকে বলল–তুমি! তুমি করেছিলে! তারপর হাসল শ্যাম।

না। তোমাকে চিনি না। শ্যাম বলল।

ময়লা এন্ডির চাদরটা গায়ে জড়িয়ে নিল শ্যাম। সাবধানে তালা দিল ঘরে। ধীর পায়ে বেরিয়ে এল।

এসে বসল সেই ছোট্ট নির্জন চায়ের দোকানটায়। এক কাপ চা নিয়ে অনেকক্ষণ বসে রইল চুপচাপ, সিগারেট ধরাল। তারপর হঠাৎ খেয়াল হতে সে বাচ্চা বয়টাকে ডেকে আর এক কাপ চা দিতে বলল। চা দিয়ে গেলে সে চায়ের কাপটা উল্টো দিকের শূন্য চেয়ারের সামনে টেবিলের ওপর রাখে, ছাইদানীটা বসায় চায়ের কাপটার পাশে, একটা সিগারেট ধরিয়ে যত্নে রাখে ছাইদানীটার ওপর। বাচ্চা বয়টা চোখ গোল করে এই দৃশ্য দেখে, দোকানের বুড়ো মালিক তাকে লক্ষ্য করে, দুটি ছোকরা খদ্দের কথা থামিয়ে চেয়ে থাকে। শ্যাম লক্ষ্যও করে না তাদের। শূন্য

চেয়ারটার সামনে টেবিলের ওপর নিঃশব্দে পুড়তে থাকে একটি আস্ত সিগারেট। ধোঁয়া উঠে উঠে ঠাণ্ডা হয়ে আসে এক কাপ চা। মনে মনে নত হয়ে কথা বলে শ্যাম–গৌর ভৌমিক, যদি পারো তবে আবার জন্ম নিও। আমি জানি, আবার জন্ম নেওয়া বড় সহজ হবে না। শূন্য থেকে জল থেকে, বাতাস থেকে, মাটি থেকে আবার নিজের শরীর সংগ্রহ করে আনা, এবং তারপরও আবার ভুল, কেবল ভুল জীবন যাপন করে যাওয়া..... তবু বড় ইচ্ছে হয় আর একবার, আরো একবার পৃথিবীতে জন্ম নিতে..... গৌর ভৌমিক, হয় না! যদি পারো আরো একবার জন্ম নিও, ততদিনে আমি পৃথিবীতে সুন্দরন করে দেবো, তুমি নিরাপদে পেরিয়ে যাবে, রাস্তার প্রতিটি বাঁক ঝড়ের বেগে পার হবে... লীলার কোলে শিশু হয়ে এসো, আমি যত্নে তোমাকে বড় করে তুলবো।...

তারপর সে ওঠে। দু'কাপ চায়ের দাম দিয়ে দেয়। বেরিয়ে পড়ে।

তুমি ছেলে ছিলে, তুমি স্বামী ছিলে, তুমি ছিলে বাবা। তুমি এত কিছু ছিলে কেউ জানতোই না। আবার দেখ, তুমিই উড়ন্ত মোটর–সাইকেলে ছুটে যাওয়া এক বিচ্ছিন্ন মানুষ। তুমি পৃথিবীর কেউ না। ... গৌর ভৌমিক, আমার ওপরওয়ালা বাসটার্ড বলে গাল না দিলে আমি কি চাকরি ছাড়তুম? চাকরি না ছাড়লে আমি খেলার ছলে তোমার মুখে ফেলতুম আয়নার আলো? দেখ, এ সবকিছুই একটি রহস্যময় কার্যকারণসূত্রে বাঁধা। তুমি কাকে দায়ী করবে? এই দুহাত শূন্যে তুলে ধরে বলছি–আমি দায়ী নই। আবার দেখ মাথা নীচু করে আমিই স্বীকার করছি–আমি দায়ী। তুমি কাকে দায়ী করবে? মাঝে মাঝে রাতে ঘুমের ঘোরে আমি ডাক দিয়ে উঠি–শ্যাম! আবার নিজেই উত্তর দিই–যাই। নিজের সঙ্গে সব বোঝাপড়া আমার শেষ হয়নি। এখনো আমার ভিতরে রয়েছে একজন অচেনা শ্যাম।..... না, পৃথিবী এখনো তেমন সুন্দর নয়, তবু আমি অপেক্ষায় আছি.... জন্ম নাও, আর একবার জন্ম নাও, আমাদের কাছে এসো..

অনেক্ষণ ধরে ধীরে হেঁটে হেঁটে বিচিত্র সব রাস্তার ভিতর দিয়ে চলে গেল শ্যাম। কখনো মাথার ভিতরে, কখনো বুকের ভিতরে ভ্রমরের গুনগুন শব্দের মতো গভীর থেকে গভীরে চলে গেল একটি মোটর-সাইকেলের শব্দ। মাঝে মাঝে চমকে উঠল শ্যাম। নিজেকে ডেকে বলল–তুমিও.. তুমিও উড়ন্ত মোটর-সাইকেলে ছুটে যাওয়া এক বিচ্ছিন্ন মানুষ। তুমি পৃথিবীর কেউ না.....

না, তা নয়। শ্যাম জানে। সে শ্যাম চক্রবর্তী, বাবা কমলাক্ষ চক্রবর্তী, বিক্রমপুরের বানিখাড়া গ্রামে তার দেশ, সে ছিল সেইন্ট অ্যান্ড মিলারের ছোটসাহেব। এ সব কিছুর মধ্যে সে বাধা আছে।

অথচ সে জানে না সে কে! কিংবা সে কি রকম।

।।১৪।।

তালু শুকনো অল্প একটু মাথা ধরা আর সামান্য পিপাসা টের পাচ্ছিল শ্যাম। তার জ্বর আসছে। দুপুরে স্নান করার সময় তার গা শিরশির করছিল। তবু তার মনে হয়েছিল যে যথেষ্ট ঠাণ্ডা হচ্ছে না তার গা। শরীরেও অনেক ময়লা জমে আছে। তোয়ালে ঘসে সারা শরীরের ময়লা তোলার চেষ্টা করেছিল সে তারপর অনেক জল ঢেলেছিল। তেল না–দেওয়া রুক্ষ শরীর শীতে ফেটে-ফুটে গেছে, সেইসব ফাটা জায়গায় ঠাণ্ডা জল ঢুকে রি-রি করে কাঁপছিল তাকে। কান কনকন করে উঠল, ঠাণ্ডায় মাথা ধরে গেল, দাঁত ব্যাথা করে উঠল। তবুও সে অনেক, অনেকক্ষণ ধরে স্নান করেছিল আজ। তারপর ময়লা এন্ডির চাদরটা গায়ে দিয়ে যখন সে হোটেলে বেরোচ্ছিল তখন থিরথির করে তার শরীর কাঁপছে, চোখে জ্বালা–জ্বালা ভাব এবং মনে সন্দেহ যে শরীর যথেষ্ট পরিষ্কার হয়নি। ময়লা রয়ে গেছে। আরো অনেকবার অনেকক্ষণ ধরে তার স্নান করা দরকার।

ভাতের প্রথম গ্রাস মুখে তুলেই সে টের পেল ঘূর্ণী ঝড়ের মতো শরীরের ভিতর থেকে বমি উল্টে আসছে। টেবিলে ভর রেখে চীনেমাটির প্লেটের ওপর সে মুখ নিচু করে রইল অনেক্ষণ। তার মুখ থেকে কস বেয়ে লালা নেমে যাচ্ছিল প্লেটের ওপর। কেউ দেখে ফেলার আগেই সে রুমালে ঢেকে নিল মুখ তারপর মুখ ধুয়ে বেরিয়ে এল। অস্পষ্ট গলায় আধঘুমন্ত ম্যানেজারকে বলল– খাবারটা কুকুরকে দিয়ে দেবেন।

কি হল?

–শরীর ভাল নেই।

বেরিয়ে এসে পানের দোকান থেকে নুন, মশলা আর লেবুর রস দেওয়া একটা সোডা খল

সে, আর দুটো মাথা ধরার বড়ি। জিভে কোনো স্বাদ নেই। তার জ্বর আসছে। হয়তো খুব অসুখ হবে তার। অনেকদিন সে তার শরীরের যত্ন নেয়নি, অনেকদিন ভাল করে লক্ষ্য করেনি নিজেকে। তাকে অন্যমনস্ক রেখে অনেকদিন ধরে তার শরীর অসুখ তৈরী করেছে। কে জানে, হয়তো এবার বহুকাল তাকে শুয়ে থাকতে হবে ঘরে কিংবা হাসপাতালে।

ধীরে ধীরে হাঁটছিল শ্যাম। অকারণে তার কেবল মনে হচ্ছিল, অসুখটা এসে পড়ার আগে কোন একটা কাজ তার শেষ করার আছে। শরীর কাঁপছে তার। মনের ভিতরেও একটা তাড়াহুড়ার ভাব, যেন বৃষ্টি আসছে–তাঁর আগেই উঠোন থেকে তুলে আনতে হবে রোদে দেওয়া কাপড়চোপড় কিংবা ডালের বড়ি। কিংবা ট্রেন ছাড়ার ঘন্টি বাজছে, সময় নেই, ছাড়ার আগেই তাই বিদায় দিতে আসা মানুষদের কয়েকটা জরুরী কথা বলে যাওয়া দরকার। আমার ঘরদোর সামলে রেখো, আমার পোষা পাখীকে দিও দানা আর জল, দেখো যেন চুরি না হয়, আমি ফিরে আসার আগেই যেন বিদায় না নেয় আমার কোনো প্রিয়জন, আমার সুন্দর বাগানে যেন না ঢোকে গরু-ছাগল, আমার নিজের হাতে লাগানো গাছগুলি যেন উড়ে না যায় বৈশাখের ঝড়ে!

এইসব অর্থহীন কথা সে বিড় বিড় করে বলছিল। ঠিক জানে না শ্যাম, কিন্তু কেবলই মনে হয় ওরকমই জরুরী কিছু কথা কাউকে তার বলে নেওয়ার আছে। কাকে! ভেবেও পেল না শ্যাম। তার চারপাশে বেলুনের মতো শূন্যে মানুষেরা হাঁটছে–তার নিতান্তই অপরিচিত এইসব মানুষ। এদের কাউকে কি?

না। মাথা নাড়ে শ্যাম। না।

শেষ দুপুরে যখন রোদে পাকা ধানের মতো রঙ ধরেছে তখন সে এসে তার থামটার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল কাচের দরজাটার মুখোমুখি। আস্তে আস্তে হাঁফাতে লাগল। চেয়ে দেখল হঠাৎ বড় ঘোলাটে হয়ে গেছে কাচ, ভিতরটা প্রায় দেখাই যায় না। বিরক্ত হল শ্যাম–এরা কাজে বড় ফাঁকি দেয়, কাচের পাল্লাটা রোজ ধোয়া–মোছা করা উচিত। তার ইচ্ছে করছিল, ভিতরে গিয়ে কথাটা ওপরওয়ালাদের বলে আসে–আপনাদের কাচের দরজাটা নোংরা হয়ে আছে। ওটাকে পরিষ্কার করে দিন।

কিন্তু শ্যাম নড়ল না। দাঁড়িয়ে রইল। সে তার সমস্ত মন এবং হৃদয় দিয়ে কাচের সেই অস্বচ্ছতা ভেদ করার চেষ্টা করছিল।

চারদিকে ছায়ার মতো অলীক লোকজন হেঁটে যাচ্ছে। কেউ টেরও পাচ্ছে না তাদের চেনা এই চতুর্দিক রাস্তাঘাট বাড়িঘর ভেদ করে এসে একে একে হেঁটে আসছে মায়াবী হরিণেরা। তাদের মৃদু খুরের শব্দ বেজে যাচ্ছে। আর মেঘ ডেকে উঠছে শরীরের ভিতরে, বৃষ্টি নামছে, সেই বৃষ্টির জলের মতো ভালবাসায় টলটল করে ভরে আসছে বুক, বহু দূরে অচেনা এক রেল পুল পেরিয়ে যাচ্ছে কালো একটা রেলগাড়ি।

স্পষ্ট দেখতে পায় না শ্যাম, তার কেবল মনে হয় ভিড় থেকে খুব লম্বা কালো চেহারার একটা লোক বেরিয়ে এসে তার সামনে দাঁড়াল। বড় নিষ্ঠুর তার মুখ, দয়াহীন। সামান্য চমকে ওঠে শ্যাম–মিনু না!

লোকটা স্থির চোখে দেখে তাকে। তার ঠোঁট নড়ছে, কথা বলছে সে। স্পষ্ট বুঝতে পারে না শ্যাম, তার মনে হয় মিনু তাকে জিজ্ঞেস করছে–তুমিকে? কি চাও?

–আমি! শ্যাম প্রাণপণে বলে–মিনু! আমি শ্যাম! চক্রবর্তী, বানিখাড়া গ্রামের কমলাক্ষ চক্রবর্তী আর বাবা.. আর তুই মিনু, নারায়ণগঞ্জের মিনু--- না?

কাঁচের দরজাটা আড়াল করে লোকটা দাঁড়ায়। প্রকাণ্ড দেখায় তার চেহারা, তার ঠোঁট আবার নড়ে উঠল। শ্যাম বুঝল মিনু বলছে–তোমাকে চিনি না। পরমুহূর্তেই ঝলসে উঠল লোকটার ডান হাত, শ্যাম দেখল সেই হাতে উকোর মতো দেখতে একটা লোহার পাঞ্চ। বিদ্যুৎগতিতে ছুটে এল সেই হাতখানা। অসহায় শ্যাম তা আটকাবার কোনো চেষ্টাই করল না। কোথায় তার লাগল তা বুঝতে পারল না সে। শুধু টের পায় মসৃণ থামের গা বেয়ে তার অবশ শরীর ফুটপাথে নেমে যাচ্ছে। তারপর আবার সে উঠে বসবার চেষ্টা করে, দেখতে পায় দু'খানা খুঁটির মতো পায়ে লোকটা তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। সে উঠতেই হকি বুটের একটা লাথি এসে বসে গেল তার পেটে। পলকে সমস্ত শরীর থেকে বমি উল্টে এল, কলকল করে তার বিস্বাদ জিভ অতিক্রম করে টক–তেতো জলের ধারা নামল। ভিজে গেল বুক। অদ্ভুত হাল্কা লাগল তার বুক–অনেকদিন ধরে

এই বমিটা তার ভিতরে জমে ছিল। আবার উঠবার চেষ্টা করে শ্যাম! কিন্তু তাকে আর উঠতে হয় না। লোকটা বাঁ হাত বাড়িয়ে গলার কাছে তার চাদরটা মুঠো করে ধরে, তারপর টেনে তুলে তাকে দাঁড় করিয়ে দেয়। আবার ঝলসে ওঠে তার ডান হাত, হাতে উকোর মতো দেখতে সেই পাঞ্চ। হাতখানা ছুটে আসে। মৃদু হাসে শ্যাম। বাধা দেয় না। ঘুষির জোরে টলে ওঠে তার মাথা, ঝনন করে ঠকে যায় পিছনের থামে। আশ্চর্য! শ্যামের বড় ভাল লাগল। টলে পড়তে পড়তে সে লোকটার চাদর-ধরা-হাতে আটকে থেকে বিড়বিড় করে-কেন মারছিস মিনু? কেন মারছিস! আমি এখানে এসে লীলার সামনে দাঁড়িয়ে থাকি বলে? নাকি অনেকদিন আগে আমি একজনের মুখে আয়নার আলো ফেলেছিলুম বলে?.... আঃ. যে কারণই হোক..... থামিস না মিনু....সাবাস!

সে শুনতে পায় মিনু বলছে- শুয়োরের বাচ্চা, বেজম্মা....

না। মাথা নাড়ে শ্যাম। আমি শ্যাম চক্রবর্তী, কমলাক্ষ চক্রবর্তী আমার বাবা, বিক্রমপুরে বানিখাড়া গ্রামে আমার দেশ....

সে দেখতে পায় পানা পুকুর ঘাটে যাওয়ার পথ, কামরাঙা গাছ আর কুয়োপাড়ের আতাবনে চকচক করছে জোনাকী পোকা, আর প্রকাণ্ড এক অন্ধকারের মধ্যে দাওয়ায় ছোট্ট একটু হ্যারিকেনের আলো করে বসে মা হঠাৎ বীজমন্ত্র ভুলে গিয়ে মৃদু স্বরে ডাকছে-মনু..মনু রে, অ মনু...মনু !....

চারদিক থেকে ছুটে আসছে লোক। লম্বা কালো চেহারার মিনু আঙুল তুলে তাকে শাসাল। ঠিক বুঝতে পারল না শ্যাম, মিনু কি বলছে, তবু সে মাথা নেড়ে বলবার চেষ্টা করল-ঠিক আছে। সব ঠিক আছে।

মিনু কাউকে কোনো জবাবদিহি করল না, নীরবে শেষবার শ্যামকে দেখে নিয়ে ভিড় ঠেলে গটগট করে বেরিয়ে গেল।

আবার আস্তে আস্তে মিনুর হাত থেকে ছাড়া-পাওয়া তার শরীর মাটির দিকে নেমে যাচ্ছিল। কেন মিনু তাকে মারল তা বুঝল না শ্যাম। বুঝবার দরকারও ছিল না। শরীর ভরে আসছে জ্বর, সে কোনো ব্যথা-বেদনা টের পায় না, তার কেবল ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে। চেয়ে দেখে, অচেনা অলীক ছায়ার মতো মানুষেরা তাকে ঘিরে জড়ো হচ্ছে। সে বিড় বিড় করে বলে-সরে যাও, ঐ কাচের দরজাটা আড়াল কোরো না।

আশ্চর্য! ভিড় ভেদ কর সে কাঁচের দরজাটা দেখতে পায়। ছায়ার মতো লীলা এসে কাঁচের গায়ে মুখ রেখে দাঁড়িয়েছে। স্পষ্ট বুঝতে পারে শ্যাম, লীলা আজ তার অপেক্ষায় ছিল। শ্যামের প্রিয় ছিল বাসন্তী রঙ। সেই রঙেরই শাড়ি পরেছে লীলা, শান্ত বিষণ্ন তার চোখ, সমস্ত শরীরের মা হওয়ার আগের নম্রতা ফুটে আছে। চাপা কান্নায় লীলার ঠোঁট কাঁপছে কেন, এত নিষ্ঠুর কেন তোমরা! ও লোকটা আমার কোনো ক্ষতি করেনি কোনোদিন....

হঠাৎ আবার শ্যামের বুকের মধ্যে গুর গুর করে মেঘ ডেকে ওঠে, চমকে ছুটতে থাকে হরিণের পাল.....তারপর কেবল হরিণ আর হরিণ, সরল ও সুন্দর চোখের হরিণেরা ছুটে আসে দিগ্বিদিক জুড়ে..... মেঘের দুপুরে অচেনা এক রেলপুল পার হতে থাকে কালো রেলগাড়ি....বৃষ্টির জলে ভরে ওঠে বুক.....

অস্বচ্ছ চোখে ভিড়ের মধ্যে এক-আধটা চেনা মুখ খুঁজে বেড়ায় শ্যাম-আঃ সোনাকাকা! রাঙ্গাপিসি! মানুমামা! আমি মনু, আমি তোমাদের মনু.... জন্ম নেওয়া বড় কষ্টকর, তবু তোমাদের জন্যই এই দেখ আমি আর একবার জন্ম নিচ্ছি... ভালবাসা যে কত কষ্টের তা জানে আমার মা, তবু আমি সেই কষ্ট বুকে করে নিলুম.. শীগগীরই আমি সুসময় নিয়ে আসছি পৃথিবীতে অপেক্ষা করো....

বড় মায়ায়, বড় ভালবাসায় ধুলোমাটির মধ্যে মুখ গুঁজে দেয় শ্যাম।

For More Books
Visit
www.BDeBooks.Com

BDeBooks.com

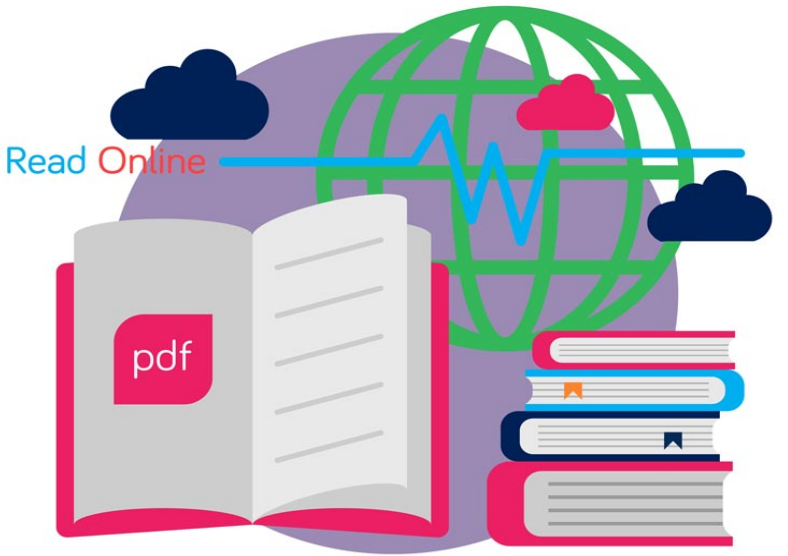

E-BOOK

www.BDeBooks.com
FB.com/BDeBooksCom
BDeBooks.Com@gmail.com